

বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের ঐতিহাসিক দলিল



সম্পাদনায়

আবদুল খালেক

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৪০

৩য় সংস্করণ (আধুঃ ১ম সংস্করণ)

রজব	১৪১৮
অগ্রহায়ণ	১৪০৪
ডিসেম্বর	১৯৯৭

বিনিময় : ৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

EHODI CHAKRANTA -Edited by Abdul Khalaque. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 75.00 Only.



ইহুদীদের স্বপ্ন রাজ্য
বৃহত্তর ইসরাঈলের নকশা
আন্তর্জাতিক সীমানা
কল্পিত বৃহত্তর ইসরাঈলের সীমানা
ফ্রি ম্যাসনদের চিহ্ন
উঃ
তুর্কী
তুর্কী
ভূমধ্য উপসাগর
অধিকৃত প্যালেস্টাইন
দামেস্ক
সিরিয়া
বাগদাদ
ইরাক
মরু সাগর
জর্দান
বসরা
কুয়েত
কায়রো
সুয়েজ
সিনাই
আকাবা উপসাগর
সুয়েজ উপসাগর
মিসর
মদীনা
রিয়াদ
কাতার
লোহিত সাগর
জেদ্দা
মক্কা
সৌদি আরব
ওমান উপসাগর

"গইম সমাজ সদাসর্বদা তাদের সংকীর্ন চিন্তাধারাকে পরিতুষ্ট করাই যথেষ্ট বিবেচনা করে। অথচ এ নির্বোধের দল একথাও জানে না যে, তাদের চিন্তাধারাটুকুও তাদের নিজস্ব নয়। এটাও আমরাই তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছি"-প্রটোকোল (পনর)

"গইম সমাজের ধ্বংস সাধনের কাজ পরিপূর্ন মাত্রায় পৌছার জন্য আমরা ফটকা বাজারীর সহকারী হিসেবে বিলাসিতা আমদানী করছি। বর্তমানে বিলাসী জীবনযাপনের উদগ্র আকাংখা গইম সমাজকে ক্রমেই গ্রাস করে চলছে"-প্রটোকোল (ছয়)

"গইম সমাজে আমরা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির এবং এক জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছি। গত ২০ শতাব্দী জুড়ে এদের মধ্যে ধর্মীয় ও অন্যান্য ধরনের বিদ্বেষ ছড়িয়েছি। এ জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করার সময় একটি রাষ্ট্রও অপর কোন রাষ্ট্রের সহযোগিতা আশা করতে পারে না।"-প্রটোকোল (পাঁচ)

বিষয় সূচী

সূচনা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم-

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّطَانِ الرَّجِيمِ-

بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ

ইহুদী জাতি সম্পর্কে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন বই-পুস্তক নেই। কালামে পাকের তাফসীর ও হাদীস শরীফের যে দু' চারখানা তরজমা এ পর্যন্ত বের হয়েছে, সেগুলোতে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহুদীদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এছাড়া রসূলুল্লাহ (সা)-এর জামানার পর ইহুদীবাদ নামীয় যে নূতন আন্দোলন শুরু হয়েছে—এ সম্পর্কে ওসব গ্রন্থে কোন কিছুই থাকা সম্ভব নয়। ইহুদী ধর্ম ও ইহুদীবাদ এক কথা নয়। ফিলিস্তিনে জোর জবরদস্তি ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করা এবং পরবর্তীকালে সমগ্র দুনিয়ায় ইহুদীদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে যে আন্দোলন উনিশ শতকের শেষ ভাগে শুরু হয়েছে তা-ই ইহুদীবাদ। ইংরেজীতে এ আন্দোলনের নাম হয়েছে Zionism (জাইওনিজম)। এ সম্পর্কে ইংরেজীতেও বই-পুস্তক রয়েছে। সম্প্রতি উর্দু ভাষায়ও কিছু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহুদীদের সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার উপযোগী বই-পত্রাদির খুবই অভাব। অথচ জঘন্য, চক্রান্তশীল ইহুদীবাদ সম্পর্কে সজাগ থাকা সকলের জন্যই বিশেষত মুসলমানদের জন্য খুবই জরুরী। আর এ জরুরত পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

আমাদের এ পুস্তকখানা মোটামুটি দু' খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ইহুদী ধর্ম, ইহুদীবাদ ও ইসরাঈল রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা ইহুদীদের রচিত একখানা গুপ্ত দলীলের তরজমা ব্যাখ্যা করেছি ! ইহুদীবাদের অনুসারী চক্রান্ত বিশারদ ইহুদী নেতাগণ সারা দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের এক কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। এর নাম হচ্ছে The Protocols of the Learned Elders of Zion. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস পাঠকমাত্রই বইখানা পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হতে বাধ্য হবেন। কারণ ঐ পুস্তকে চক্রান্তজালের যে কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে তা পাঠ করার সময় পাঠক অনুভব করতে বাধ্য হবেন যে, তিনি নিজেও এ ষড়যন্ত্র জালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আর ঐ বইতে Protocols মানব

সমাজের পরিণতি সম্পর্কে যে ভবিষদ্বাণী করা হয়েছে—গোটা দুনিয়াকে সে পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে দেখে পাঠক ভয়ে শিউরে উঠবেন, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। আমরা তাই প্রটোকোলের তরজমা সহকারে এ বইখানা পাঠকের সামনে পেশ করলাম। এখানে বলে রাখা উচিত যে, প্রটোকোলের ইংরেজী সংস্করণ থেকে আমরা বাংলা তরজমা করেছি। মূল পুস্তকখানা হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান এ বইখানা মারফত ইহুদীদের জঘন্য চক্রান্ত সম্পর্কে কিছু তথ্য অবগত হয়ে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো।

—লেখক

ইহুদী জাতি

পরিচয়

হযরত ইবরাহীম (আ) খলিলুল্লাহর পৌত্র হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। 'ইসরাঈল' শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। নমরুদ বাদশাহর প্রধান পুরোহিত এবং পূজারী আজরের পুত্র হয়েও ইবরাহীম খলিলুল্লাহ তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন করেন এবং শির্‌ক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখেন। এ জন্যে পৌত্তলিক বাদশাহ নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তায়ালার অপার রহমতে নির্ভীক মু'মিন ও মহান নবী হযরত ইবরাহীম (আ) অগ্নিকুণ্ড থেকে অক্ষত দেহে বের হয়ে আসেন। তারপর তাঁর পৈতৃক দেশ ইরাক থেকে হিজরত করে তিনি জর্দান, মিসর ও সউদী আরবসহ বিভিন্ন এলাকায় পায়ে হেঁটে হেঁটে 'দ্বীনে হকের' দাওয়াত পেশ করতে শুরু করেন।

বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈলকে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে কুরবানী করার জন্য তাঁর গলায় ছুরি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীনে হকের প্রতি ঈমানের যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং দ্বীনের জন্য নিজের যথা সর্বস্ব কুরবানী করার যে নজীর স্থাপন করে গেছেন তাঁর পুরস্কার স্বরূপ তাঁর বংশে অনেক নবী জন্মগ্রহণ করেন এবং দুনিয়ার উপর কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর বংশেই শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত ইবরাহীমের (আ) এক পুত্রের নাম হযরত ইসহাক (আ) এবং হযরত ইসহাকের (আ) পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ) নবীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী। হযরত ইয়াকুবের বংশধরগণ বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। উপরে দীর্ঘকাল যাবত দুনিয়ায় হযরত ইবরাহীমের (আ) বংশধরদের শাসন ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলই হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ইবরাহীমের বংশধরদের সে শাখা। এ শাখারই একটি অংশ পরবর্তীকালে নিজেদের ইহুদী নামে পরিচয় দিতে শুরু করে। হযরত ইয়াকুবেরই এক পুত্রের নাম ছিল ইয়াহুদা।

হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক থেকে হিজরত করার পর সিরিয়াতে বসবাস করেন। তাঁর পৌত্র হযরত ইয়াকুব (আ) মিসরে চলে গিয়েছিলেন। হযরত ইয়াকুবের (আ) পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মিসরের শাসনকর্তা হয়ে যান এবং তিনি তাঁর মাতা-পিতা ও অন্যান্য ভাইদের

সিরিয়া থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। এভাবেই বনী ইসরাঈল জাতি মিসরে বসবাস শুরু করে এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশ সমস্ত মিসরেই ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় ৪০০ বছর পরে মিসরের শাসন ক্ষমতা বনী ইসরাঈলদের হস্তচ্যুত হয় এবং ফেরাউন উপাধিধারী যালিম শাসক গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। ফেরাউনী শাসকেরা বনী ইসরাঈলদের সাথে দাসসুলভ ব্যবহার করতো। ভবিষ্যতে ফেরাউনদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে, এ আশংকায় যালিম শাসকেরা বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করতো।

আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে হযরত মূসা (আ) ফেরাউনদের হত্যা অভিযান থেকে শুধু রক্ষাই পাননি বরং ফেরাউনের পরিবারেই প্রতিপালিত হন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের ফেরাউনী যুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য সংগঠিত করেন এবং এক রাত্রিতে তাদের নিয়ে মিসর থেকে হিজরত করেন। ফেরাউন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের পশ্চাদ্ধাবন করে। আল্লাহ তায়ালার এমনি মহিমা যে, সাগরের পানি দু' ভাগ হয়ে হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদের জন্য পথ তৈরী করে দেয়। ঐ পথে ফেরাউনও এগুতে চাইলে বিভক্ত পানি পুনরায় একত্রিত হয়ে যায় এবং ফেরাউন ঐ স্থানেই ডুবে মরে।

সাগর পাড়ি দিয়ে সিনাই অঞ্চলের তীহ্ মরুভূমি অতিক্রম করার সময় প্রখর রৌদ্র তাপের কষ্ট এবং পানি ও আহার্যের অভাব থেকে বনী ইসরাঈলদের নিরাপদ রাখার জন্য মেঘমালার দ্বারা ছায়া করে দেয়া হয়, শিলা খণ্ড থেকে পানির প্রস্রবণ বের হয়ে আসে এবং "মান্না ও সালওয়া" নামক বিশেষ খাদ্য নাযিল হয়।

আল্লাহ তায়ালার এত অনুগ্রহ লাভ সত্ত্বেও মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে তূর পাহাড়ে যাবার পরে বনী ইসরাঈলগণ বাছুরের মূর্তি তৈরী করে পূজা করতে শুরু করে। মূসা (আ) ফিরে আসার পর এরা অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা এদের গুনাহ মাফ করে দেন। পুনরায় দ্বীনের জন্য বনী ইসরাঈলদের লড়তে নির্দেশ দিলে এরা জবাব দিয়েছিল, "মূসা, তুমি ও তোমার খোদা যুদ্ধ কর। আমরা তো নিজেদের জায়গা থেকে নড়বো না।" এদের এ মানসিক অবস্থার দরুন ৪০ বছর পর্যন্ত এরা আশ্রয়হীন অবস্থায় যাযাবরের জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এদের সকল বয়স্ক লোকেরা মরে যায়। এমন কি হযরত মূসা (আ)-ও আল্লাহর ডাকে তাঁর দরবারে হাযির হয়ে

যান। পরবর্তী বংশধরদের আমলে ফিলিস্তিনে বনী ইসরাঈলদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহুদীদের অপরাধ প্রবণতা

কিছুকাল পর বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহর নাফরমানি শুরু করে দেয় এবং এরই শাস্তিস্বরূপ জালুত নামক এক অত্যাচারী শাসক এ জাতির গর্দানে সওয়ার হয়ে যায়। জালুতের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এরা আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তালুত নামক আল্লাহর এক নেক বান্দার নেতৃত্বে জিহাদ করে জালুতের শাসন থেকে এরা মুক্তি লাভ করেন।

তালুতের পর হযরত দাউদ (আ) এবং তারপর হযরত সুলাইমান (আ) আগমন করেন এবং তাঁদের জামানায় বনী ইসরাঈল জাতি সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে পৌঁছে যায়।

হযরত সুলাইমানের (আ) পর ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের দরুনই বনী ইসরাঈলগণ পুনরায় আল্লাহ তায়ালার বিধি-নিষেধ লংঘন করতে শুরু করে। ক্রমে এরা নৈতিক অধপতনের সর্বশেষ স্তরে নেমে যায়। আল্লাহর বিধি-নিষেধের প্রকাশ্য বিরোধিতা শাসক ও নেতাদের স্বভাবে পরিণত হয়। এদের আলেমগণ ক্ষমতাসীনদের মরজী মাফিক আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে শাসকদের সকল অপকর্মের সমর্থন যোগাতে থাকে। নানাবিধ জঘন্য অপরাধ সমাজের সর্বত্র শিকড় বিস্তার করে ফেলে। বাইরে দ্বীনের খোলসটা মাত্র বাকী রেখে ভেতরে দ্বীনের বিরোধী কার্যকলাপে ইহুদী জাতি অনেক দূর এগিয়ে যায়। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, যাকাত বন্ধ করে দিয়ে সুদের ভিত্তিতে লেন-দেন ও আদান-প্রদানের প্রসার, জ্বেনা-ব্যভিচার ও অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি ইহুদী সমাজে আর দূষণীয় বিবেচিত হতো না।

আল্লাহ তায়ালা এদের সংশোধনের জন্য বহু নবী পাঠিয়েছেন এবং তারা এসে গুমরাহীর অতল তলে নিমজ্জিত ইহুদীদের উদ্ধার করার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিকৃতি ও গুমরাহী এদের সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া করে তুলেছিল। তাই এরা নবীদের উপরও অন্যায়-অত্যাচার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা-সংকোচ করেনি। বরং আল্লাহর প্রেরিত বহু পূত-চরিত্র নবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করতেও এরা কসুর করেনি। আমরা নিম্নে অপরাধ প্রবণ ইহুদী জাতির নৃশংসতার কতিপয় নজীর পেশ করছি ঃ

(১) হযরত সুলাইমানের (আ) পর বনী ইসরাঈলদের রাষ্ট্র ইহুদীয়া ও ইসরাঈল নামে দু'টি পৃথক দেশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক শত্রুতায় অন্ধ হয়ে একে অপরের ধ্বংস সাধনের জন্য অন্যান্য জাতির সাহায্য প্রার্থী হয়।

হান্নানী নবী আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ইহুদীদের এহেন কার্যকলাপের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু ইহুদীয়া রাষ্ট্রের তৎকালীন শাসক 'আছা' হান্নানী নবীর নসিহত গ্রহণ করার পরিবর্তে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

(২) হযরত ইলিয়াস (আ) ইহুদীদের পৌত্তলিকতা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং তাওহীদের প্রতি ফিরে আসার জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। ইসরাঈলী শাসক 'আখিয়াব' তার মুশরিক স্ত্রীর খাহেশ পূরণ করার জন্য হযরত ইলিয়াস (আ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করে। আল্লাহর নবী অবশেষে সিনাই এলাকায় একটি পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

(৩) এ 'আখিয়াব'ই সত্য কথনের অপরাধে হযরত ইলিয়াস (আ)-কে কারারুদ্ধ করে এবং তাঁকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কষ্ট দেয়।

(৪) ইসরাঈল রাষ্ট্র 'আশুরীয়'দের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবার পর ইহুদীয়া রাজ্যের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। কিন্তু ইহুদীদের সেদিকে মোটেই খেয়াল ছিল না। এরা মনের আনন্দে আল্লাহর নাফরমানী করছিল। হযরত ইরমিয়া নবী এদের সতর্ক করে দেন এবং দেশের আনাচে-কানাচে সফর করে আল্লাহর আনুগত্যে ফিরে আসার জন্য দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু ইহুদী জাতি নসিহত কবুল করাতো দূরের কথা, উল্টা ইরমিয়া নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গালাগাল ও মারপিট করে এবং অবশেষে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করার জন্য কাদা ভর্তি চৌবাচ্চায় ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁধে দেয়।

(৫) ইহুদীয়া রাষ্ট্রের শাসক হিরোদিসের দরবারে প্রকাশ্যে নৈতিকতা বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপ দিন দিন বেড়ে চলছিল। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) এসব পাপাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং নৈতিক অধপতনের চরম পরিণতি সম্পর্কে বাদশাহ ও জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন। বাদশাহ হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে কতল করে তাঁর ছিন্ন মস্তক এক রক্ষিতাকে উপহার দেয়।

(৬) হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈল আলেম ও রাষ্ট্র নেতাদের বিরাগ ভাজন হন। কেননা, তিনি এদের খোদাদ্রোহিতা ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার অনুগত হয়ে পবিত্র জীবনযাপন করার দাওয়াত দিতেন।

হযরত ঈসা (আ)-কে কোন উপায়েই দাওয়াতে দ্বীনের কাজ থেকে বিরত করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে ফাঁসীর দণ্ডাদেশ দেয়া হয়। এতদুপলক্ষ্যে সমবেত আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট বাদশাহ

পিলাতুছ বলেন যে, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একজন কয়েদীকে ঈদ উপলক্ষে মুক্তি দেয়া হবে। হযরত ঈসা (আ) এবং 'বুরাবা' নামক এক ডাকাতের মধ্য থেকে জনতা কার মুক্তি কামনা করে—বাদশাহ তা জানতে চাইলে সমবেত সকলে সমস্বরে 'বুরাবা'কে মুক্তি দিয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে ফাঁসী দেয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে।

এগুলো হচ্ছে বাইবেল বর্ণিত ঘটনা। কুরআন পাকেও এদের জঘন্য চরিত্র সম্পর্কে অনেক আলোচনা রয়েছে।

ইহুদীদের প্রতি খোদায়ী আযাব

ইহুদীদের এ অপরাধ প্রবণতার দরুন আল্লাহ তায়ালা এদের এমন শাস্তি দেন যে, বিভিন্ন জাতি এদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে তছ্‌তছ্‌ করে দেয়। আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃষ্টপূর্ব ৭২৪ সালে ইসরাঈল রাজ্য আক্রমণ করে হাজার হাজার ইহুদীকে হত্যা করেছিল এবং আরও কয়েক হাজার ইহুদীকে বেঁধে গোলাম হিসেবে নিজের দেশে নিয়ে গিয়েছিল।

পুনরায় খৃষ্টপূর্ব ৫৬১ সালে ব্যবিলনের শাসক বখত নছর জেরুজালেম আক্রমণ করে শহরটিকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় এবং ৭০ হাজার ইহুদীকে বন্দী করে নিজ দেশে নিয়ে যায়।

৭০ ঈসায়ী সালে রোমীয়গণ ইহুদীয়া রাজ্য আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার ইহুদীকে তরবারীর আঘাতে পরপারের পথে চালান দেয়।

১৩২ সালে রোমীয়গণ পুনরায় ফিলিস্তিন আক্রমণ করে এবং ইহুদীদের সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়।

পরপর বিদেশীদের আক্রমণ ও রোমীয় শাসকদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ইহুদী জাতি বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং এভাবে সারা দুনিয়ায় এরা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহর দুনিয়ায় নিজেদের আবাসভূমি বলতে এদের কোন স্থান রইল না। যে দেশেই গিয়েছে সেখানেই ঘৃণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। কারণ এরা সর্বত্রই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের স্বার্থলিপ্সায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতিসাধন করেছে।

ইহুদীদের অর্থলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল। অর্থোপার্জনে এদের ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নেই। সুদী কারবারে তো এরা দুনিয়া জোড়া দুর্নামের ভাগী হয়েছে। নানা ছলা-কলায় অপরের সম্পদ হাসেল করার ব্যাপারে এরা সিদ্ধহস্ত। এছাড়া ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত এদের রক্তের সাথে মিশে থাকার দরুন পৃথিবীর কোন

দেশেই এরা সমাদৃত হয়নি। বরং বিভিন্ন সময় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এদের নির্মমভাবে বিতাড়িত করা হয়েছে।

১২৯০ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে ইহুদীদের বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স প্রথম দফা ১৩০৬ সালে এবং দ্বিতীয় দফা ১৩৯৪ সালে এদেরকে সে দেশ থেকে বের করে দেয়। ১৩৭০ সালে বেলজিয়াম এবং ১৩৮০ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া ইহুদীদের নির্বাসিত করে। ১৪৪৪ সালে হল্যাণ্ড এবং ১৫৪০ সালে ইটালী ইহুদীদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ১৫৫১ সালে জার্মানী থেকে এবং ১৫১০ সালে রাশিয়া থেকে ইহুদী জাতি বিতাড়িত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ইহুদীদের পাইকারী হারে হত্যা করে। এভাবে হত্যা, লাঞ্ছনা, নির্বাসন ইত্যাদি ধরনের দুর্ভোগের কাহিনীতে ইহুদী জাতির ইতিহাস ভরপুর।

ইহুদীদের দৃষ্টিতে অন-ইহুদী

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ'-এ দুনিয়ার অন-ইহুদী সম্পর্কে নিম্নলিখিত ঘোষণাবলী পাওয়া যায় ঃ

(১) অন-ইহুদী মানুষের ধন-সম্পদের কোন মালিকানা নেই। ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ইহুদী জাতি। অন-ইহুদীদের অর্জিত ধন-সম্পদ ন্যায়তই ইহুদীগণ দখল করে নিতে পারে।

(২) অন-ইহুদী মানুষ ও তাদের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্যই খোদা তায়ালা ইহুদী জাতিকে দুনিয়াতে মনোনীত করেছেন।

(৩) মানুষ যেমন সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি ইহুদী জাতিও মাটির পৃথিবীতে বসবাসকারী সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহুদী ছাড়া সকল মানুষেরই মধ্যে পশুত্ব ও পাপ-প্রবৃত্তি রয়েছে।

(৪) খোদা তায়ালা অন-ইহুদীদের নিকট থেকে সুদ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিনা সুদে অন-ইহুদীদের ধার দিতে নিষেধ করেছেন।

ধর্মগ্রন্থই যখন মানুষকে ঘৃণা করে ও শোষণ করতে এবং পরের সম্পদ জবরদখল করার উৎসাহ দিয়েছে—তখন এদের স্বভাব-চরিত্র কোন্ ধরনের হবে তা সহজেই অনুমেয়। ইহুদী জাতি যে খোদার কিতাবকে বিকৃত করেছে —তা কুরআন পাকেই উল্লেখ করা হয়েছে। তালমুদের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, ইহুদী জাতি নিজেদের মানসিক অবনতির সাথে ধর্মগ্রন্থকে সামঞ্জস্যশীল করার জন্য নিজেদের খাহেশ মাফিক ধর্ম-বিধান রচনা করে তালমুদে লিখে নিয়েছে।

ইহুদীদের ইসলাম দুশমনী

বনী ইসরাঈল বংশে বহুসংখ্যক নবী জন্মগ্রহণ করার ফলে ইহুদীদের ধারণা জন্মেছিল যে, এরা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত জাতি। তাই এরা যত অনাচারই করুক না কেন, কখনও তাদের দোযখে যেতে হবে না। ইহুদী জাতির তুলনায় দুনিয়ার অন্যান্য মানুষকে এরা হেয় মনে করতো এবং একথাও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ তায়ালা যত নবীই প্রেরণ করুন না কেন, সকলেই ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করবেন।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রোমীয়দের আক্রমণের ফলে বহু ইহুদী ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ইহুদী হেজাজ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তুলনায় শিক্ষা ও সভ্যতায় নবাগত ইহুদী সম্প্রদায় অধিকতর উন্নত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জমাজমি সংক্রান্ত বৈষয়িক বুদ্ধিও এদেরই প্রখর ছিল।

ফলে, এতদঞ্চলের ভাল ভাল ফসলের জমি ও বড় বড় ব্যবসা এদেরই কুক্ষিগত হয়ে যায়। ইহুদী আলেম ও পীর-পুরোহিতগণ ধার্মিকতার বাহ্যিক ঠাঁট দেখিয়ে স্থানীয় লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর ইহুদী ধনপতিগণ সুদী লেন-দেনের লগ্নী কারবার করে স্থানীয় অর্থনৈতিক উপায় উপাদানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নিয়েছিল।

হযরত রাসূলে করীম (সা) মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ইহুদীদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। ইহুদী আলেমগণ রাসূলে খোদাকে দেখা মাত্রই বুঝতে পেরেছিল যে, ইনিই আখেরী জামানার নবী। কারণ তাওরাত কিতাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর বিস্তারিত পরিচয় দান করা হয়েছিল এবং ইহুদী আলেমগণ শেষ নবী আগমনের সাথে সাথে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে বিশ্ব বিজয়ী হবার প্রতীক্ষায় ছিল।

কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-কে চিনতে পারা সত্ত্বেও ইহুদী আলেমগণ তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নিতে রাজি হলো না। এর কারণ ছিল প্রধানত দু'টি। প্রথম কারণ হচ্ছে, জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের দাওয়াত। ইহুদী জাতি বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছিল। দ্বীন শুধু এদের ব্যক্তি জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলে করীমের (সা) দাওয়াতে সাড়া দিতে হলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়। আর তা করতে গেলেই নানা ধরনের বৈষয়িক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। এ জন্যেই তারা এ দ্বীন গ্রহণ করতে রাজী হয়নি।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, এদের গোত্রীয় বিদ্বেষ। ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল আখেরী জামানার নবী ইহুদী বংশে জন্মাবেন। কিন্তু রাসূলে করীম (সা) জন্মগ্রহণ করলেন কুরাইশ বংশে। তাই বংশীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা করার পথই এরা বেছে নেয়।

মিথ্যা প্রচারণা, অহেতুক সন্দেহ সৃষ্টিকারী গুজব ছড়ানো, তাওরাত কিতাবের আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা অথবা বিশেষ বিশেষ আয়াত গোপন করে আখেরী নবীর লক্ষণসমূহ জনগণকে জানতে না দেয়া, ইত্যাদি ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পন্থায় এরা ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

রাসূলে করীম (সা) মদীনায় হিজরত করার পরপরই ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তি মারফত ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেন। এ চুক্তি মোতাবিক মদীনায় ইসলামী শাসন কায়েম হয়ে যায় এবং ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করা হয়। ইহুদীগণ নাগরিক অধিকারসহ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবে এবং বাইরের দুশমন দ্বারা মদীনা আক্রান্ত হলে প্রতিরক্ষা কার্যে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়।

কিন্তু চক্রান্তশীল ইহুদী একদিকে পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করছিল আর অপরদিকে মুনাফিক ও বাইরের শত্রুদের সাথে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনে তৎপর ছিল।

বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম ও কুফরের সশস্ত্র সম্মুখ সমরে মুসলমানদের পরাজয়ই ছিল ইহুদীদের কাম্য। এরা তাই মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শাহাদাতের মিথ্যা খবর রটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সত্য প্রকাশ হয়ে যাবার পর এরা নিরাশ হলো। বনী নজীর গোত্রের সরদার কা'ব বিন আশরাফ মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ বরদাশত করতে না পেরে মক্কায় চলে যায় এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার জন্য কুরাইশদের উস্কানী দেবার কাজে লিপ্ত হয়। কিছুদিন পর মদীনায় ফিরে এসে মুসলমান মহিলাদের নামে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ গান ও কবিতার আসর জমিয়ে মনের ক্ষোভ মিটাতে শুরু করে। তৃতীয় হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলে করীম (সা) তাকে 'কতল' করিয়ে দেন।

ইহুদীদের অপর একটি গোত্র বনী কাইনুকাদের সাত শ' সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। এদের মহল্লায় একটি বাজার ছিল। মুসলমানেরাও এ বাজারে যাতায়াত করতো। বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীরা নানা উপায়ে মুসলমানদের উত্যক্ত করতে শুরু করে এবং একদিন প্রকাশ্য বাজারে একজন মুসলিম মহিলাকে উলংগ করে ফেলে। এ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে দাঙ্গা হয়

এবং এ দাঙ্গায় উভয় পক্ষের একজন করে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বনী কাইনুকার মহল্লায় গমন করেন। ইহুদীদল হুজুরের (সা) সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তাই দ্বিতীয় হিজরী সালের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ (সা) বনী কাইনুকাদের মহল্লা ঘেরাও করেন। ১৫ দিন পর এরা আত্মসমর্পণ করে এবং এদের সকল সমর্থ লোকদের গ্রেফতার করা হয়। মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সুপারিশে রাসূলুল্লাহ (সা) বনী কাইনুকার লোকদের শূন্য হাতে মদীনা ত্যাগ করার অনুমতি দেন।

ওহোদের যুদ্ধের সময় চুক্তিপত্রের শর্ত মুতাবিক মদীনার প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইহুদীরা অস্বীকার করে।

একটি খুন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার জন্য রাসূলে খোদা (সা) একদিন ইহুদীদের অপর গোত্র বনী নাজিরদের মহল্লায় গমন করেন। চক্রান্তশীল ইহুদীগণ একটি উঁচু স্থান থেকে বড় আকারের একটি পাথর গড়িয়ে দিয়ে হুজুর (সা)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

হযরত রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর ইঙ্গিতে সে স্থান ত্যাগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বনী নাজিরদের দশদিন সময়ের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইহুদী দল হুজুরের নির্দেশ পালন করলো না। হুজুর (সা) বাধ্য হয়ে এদের মহল্লা অবরোধ করেন এবং এরা আত্মসমর্পণ করার পর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া উটের পিঠে বহন করে যে পরিমাণ মালপত্র নেয়া সম্ভব তা নিয়ে মদীনা ত্যাগ করার অনুমতি দেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় কুরাইশ বংশ বিপুল শক্তি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। মদীনা থেকে বিতাড়িত পূর্বোল্লেখিত বনী কাইনুকা এবং বনী নাজীর গোত্রীয় ইহুদীরাও এদের সঙ্গে ছিল। সে সময় ইহুদীদের অপর একটি গোত্র বনী কুরাইজা মদীনায় বসবাস করছিল এবং মুসলমানদের সঙ্গে এদের সম্বন্ধও ভালো ছিল। চুক্তি মুতাবিক ইহুদী সম্প্রদায় নিজ নিজ বসবাসের এলাকার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু যুদ্ধ যে সময় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে ঠিক সে সময় বনী কুরাইজা বিশ্বাসঘাতকতা করে আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগদান করে। হুজুর (সা) এ খবর জানতে পেরে তৎক্ষণাত নয়া পরিস্থিতি মুতাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদেরই জয় হয় এবং আক্রমণকারী দল পালিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা) বনী কুরাইজার আবাসিক এলাকা অবরোধ করেন। তিন সপ্তাহ অবরোধের ভেতর কাটানোর পর ইহুদী নেতারা জানায় যে, বনী কুরাইজার মিত্রপক্ষীয় 'আওস' গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ বিন মায়াজ (রা) সালিশী করে যা রায় দেন তা মেনে

নেয়ার শর্তে এরা আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। রাসূলে করীম (সা) এ শর্ত মেনে নিলেন এবং হযরত সায়াদ বিন মায়াজকে (রা) বিষয়টি সম্পর্কে সালিশী করার ভার দিলেন। হযরত সায়াদ (রা) ইহুদীদের ভালভাবেই জানতেন। তাই তিনি রায় দিলেন, "ইহুদীদের সকল পুরুষদের হত্যা করা হোক, সকল স্ত্রীলোকদের বাঁদী করে নেয়া হোক এবং এদের সকল সম্পত্তি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হোক।" এ ফায়সালার পর মুসলমান সৈন্য ইহুদীদের ঘরে তল্লাসী করে ১৫০০ তরবারী, ৩০০ বর্ম, ২০০০ বর্শা এবং ১৫০০ ঢাল হস্তগত করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এরা এ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিল। মোদ্দাকথা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনি ইহুদীদের মজ্জাগত। অতীতে যেভাবে এরা জঘন্য ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও হীনপন্থা অবলম্বন করে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে আজও সেভাবেই করছে। এদের মুসলিম বিদ্বেষ আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং পুরুষানুক্রমে এদের অন্তরের এ বিদ্বেষ ক্রমে বেড়েই চলেছে।

বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ইতিকথা

আমরা ইতিপূর্বে ইহুদীদের ফিলিস্তিন থেকে বের হয়ে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার বিষয় উল্লেখ করেছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে যদিও এরা স্থানীয় ভাষায় কথা বলা ও স্থানীয় রীতিনীতিতে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তথাপি অর্থ-সম্পদ হাসিল করা ছাড়া দেশের সামগ্রিক সমস্যাবলী সম্পর্কে এদের কোনই মাথাব্যথা ছিল না। বিভিন্ন দেশে এরা প্রচুর অর্থোপার্জনের কাজেই সর্বদা লিপ্ত ছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে এদের একাত্মবোধ কখনও জন্মায়নি বরং বিভিন্ন দেশের বিপদ-আপদের সময় এরা দেশের স্বার্থ বিরোধী পন্থাই অবলম্বন করেছে। তাই বিভিন্ন দেশ থেকে বারবার এদের বহিষ্কারও করা হয়েছে।

ইহুদী ধর্মের একটা বড় দুর্বলতা এই যে, হিন্দু ধর্মেরই মতো এটা গোত্রীয় ধর্ম। ইহুদী বা হিন্দুর পরিবারে জন্মগ্রহণ ছাড়া, এ দু'টি ধর্মে প্রবেশ করার কোন উপায় নেই। এ জন্যই এ উভয় ধর্ম তাদের অনুসরণকারীদের মনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে। দুনিয়ায় অপরাপর মানুষকে এরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না।

ইহুদী সম্প্রদায় খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যে সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন অন্যান্য ধর্ম বিশেষ করে খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলামের প্রচারে অনেক ইহুদী খৃষ্টান অথবা মুসলিম হয়ে যায়। এ 'বিপদ' থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইহুদী সম্প্রদায় নিজেদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় এবং নানাবিধ বিধি-নিষেধের গণ্ডী খাড়া করে অন্যান্য ধর্মের প্রচারকার্যের প্রভাব প্রতিরোধ করতে প্রয়াস পায়। এ কারণেও এরা মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তাই খৃষ্টান শাসিত দেশগুলোতে এরা নাগরিক মর্যাদা লাভ করতে পারেনি।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ইহুদীদের জন্য মুক্তির পয়গাম বহন করে আনে। ইহুদীদের রচিত বিশ্বব্যাপী চক্রান্তের পরিকল্পনা পুস্তক প্রটোকোল (এর তরজমা পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে) থেকে জানা যায় যে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইহুদী ষড়যন্ত্রকারীদেরই হাত ছিল। যা হোক এ বিপ্লবের ফলে উনিশ শতকের শেষাংশে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ড ইহুদীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার দান করে। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে ইহুদীদের তখনও ঘৃণার চোখে দেখা হতো এবং সেখানে আযাদীর সুখ থেকে এরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। অষ্ট্রিয়ায় ইহুদী সাংবাদিক

থিউডর হার্টজেল সর্বপ্রথম ইহুদীদের মধ্যে আযাদীর প্রেরণা সৃষ্টি করে। এ জন্য তাকে ইহুদীবাদের[১] জনক বলা হয়।

প্রারম্ভে থিউডর হার্টজেল ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার কোন পরিকল্পনা করেনি। সে বরং ইংরেজদের পরামর্শে পূর্ব আফ্রিকায় একটি আযাদ ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু অন্যান্য ইহুদী নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করার পর তার মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং তার লুব্ধ দৃষ্টি ফিলিস্তিনের প্রতিই আকৃষ্ট হয়।

হার্টজেল তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একদিকে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শাসকগণের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দেয় এবং অপর দিকে তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদ (দ্বিতীয়)-এর সাথে দেখা করে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বসবাসের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। স্বভাব সুলভ পন্থায় ইহুদীদল সুলতানকে ৫ কোটি পাউণ্ড অর্থ সাহায্য পেশ করে তুর্কী খিলাফতের অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সুলতান আবদুল হামিদ এদের অসদুদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই ইহুদীদের আবেদন নাকচ করে দেন এবং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় ইহুদী সম্প্রদায় কখনও ফিলিস্তিনে বসবাস করার অনুমতি লাভ করতে পারবে না।

থিউডর হার্টজেল সুলতান আবদুল হামিদের নিকট থেকে নিরাশ হয়ে পুনরায় ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ১৮৯৭ সালের ২৯শে আগষ্ট সুইজারল্যাণ্ডে ইহুদী কংগ্রেসের বৈঠক আহ্বান করে। উক্ত বৈঠকে নিম্নরূপ ফায়সালা গৃহীত হয়।

(১) ফিলিস্তিনকে ইহুদী রাজ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ইহুদীদের সুপরিকল্পিত উপায়ে কৃষি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অগ্রসর করানো।

(২) সমগ্র দুনিয়ার ইহুদীদের সংঘবদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন কায়েম করণ।

(৩) ইহুদীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ।

(৪) আর উপরের তিন দফা কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা-তদবির জারী রাখা।

---

১. ইহুদীবাদ ও ইহুদী ধর্ম দু'টি পৃথক মতবাদ। ইহুদী ধর্ম বহু পুরাতন কিন্তু ইহুদীবাদ উনিশ শতকের শেষাংশে জন্মগ্রহণ করে। ফিলিস্তিনকে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার আন্দোলনকে ইংরেজীতে Zionism বলা হয়। Zion পাহাড়ের নাম থেকেই আন্দোলনের এ নামকরণ করা হয়েছে। বাংলায় আমরা এর তরজমা করেছি ইহুদীবাদ।

সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে ইহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ চক্রান্ত জাল বিস্তার করে। একদিকে আরব ও অনারবদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে তুর্কী খিলাফতের অধীনে যেসব আরব অফিসার ও সৈন্য নিয়োজিত ছিল তাদের মনে তুর্কীর সুলতানের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করার কাজ ইংরেজ ও ইহুদী সম্প্রদায় যুক্তভাবে শুরু করে। আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাগত জাতীয়তার সস্তা ও মুখরোচক শ্লোগানে মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করার এ হীন প্রচেষ্টা নব্য সমাজকে সহজে আকৃষ্ট করে এবং এর ফলে আরব তুর্কী সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

অপর দিকে 'ফ্রি ম্যাসন' আন্দোলন তুর্কীর অভ্যন্তরে যুবক শ্রেণীকে খিলাফত ও ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজে লিপ্ত হয়। তুর্কীর বিপ্লব প্রধানত ইহুদীদেরই পরিকল্পনা মোতাবিক সংঘঠিত হয়েছিল। কামাল পাশা ইহুদীদেরই ক্রীড়নক হিসেবে ময়দানে কাজ করেছেন মাত্র। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলোতে আমাদের এ দাবীর প্রমাণ মওজুদ রয়েছে।

[1] Revolutions and Military Rule in the Middle East. by M. Haddad.

[2] Rise of Nationality in the Balkans. by R.W. Setin-Watson.

[3] The Emergence of Modern Turky. by Bernard Lewis.

[4] ATATURK—The returnth of a NATION. by Lord Kirnoss.

তুর্কীর খিলাফত মুসলিম জাহানের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের একটা কেন্দ্র ছিল। সমগ্র মুসলিম জাহান এ খিলাফতকে কেন্দ্র করেই পরস্পরের প্রতি এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অনুভব করতো। ইংরেজ ও ইহুদী ষড়যন্ত্রের ফলে খিলাফত উচ্ছেদ হয়ে গেল। এবং মুসলিম জাহানের ঐক্য সূত্র ছিন্ন হল। তারপর থেকে মুসলমান দেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে নিজেদেরকে ইহুদী ও খৃষ্টান চক্রান্তের খপ্পরে নিক্ষেপ করেছে।

কামাল পাশা ২৫,০০০ ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। খ্যাতনামা আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদদেরও পৈশাচিক আনন্দে হত্যা করে কামাল পাশা 'গাজী' উপাধী ধারণ করেন। নিহত ব্যক্তিদের একটি মাত্র 'অপরাধ' ছিল আর তাহলো ইসলামী আদর্শের প্রতি তাদের অটল বিশ্বাস। কামাল পাশা ইসলামী ইবাদত, ইসলামী রীতিনীতি ও আদব-কায়দা সবকিছুই নিষিদ্ধ করেন। এমনকি আরবী ভাষায় কুরআন শরীফ পাঠ করাও অপরাধ বিবেচনা করেন। এভাবে ইসলাম বিরোধী ও ইহুদী প্রভাবান্বিত পরিবেশ সৃষ্টি

হবার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের রাষ্ট্র স্থাপনের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। আরব অনারব বিভেদে মুসলিম শক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং ক্রিয়াসব আন্দোলনের প্রভাবে কামাল পাশার ইসলাম বিরোধী তৎপরতা ইহুদীদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ইহুদী চক্রান্ত একদিকে মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি ও নানাবিধ ছদ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে যুবসমাজকে ইসলামের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করে তোলার কাজ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার আন্দোলনও চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯১৬ ঈসায়ী সালে ইহুদীদের বিশ্ব সংস্থা "ওয়ার্লড জাইওনিষ্ট অর্গানাইজেশন" (World Zionist Organisation) বৃটেনের পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হয় এবং এর ফলে ১৯১৭ সালে বৃটিশ সরকার কুখ্যাত "ব্যালফোর" ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি স্থাপনের দাবী সমর্থন করে। 'ব্যালফোর' ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, মহামান্য বৃটিশ রাজার সরকার ইহুদী আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি পোষণ করে এবং ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি স্থাপনের দাবী সমর্থন করে। এতদসঙ্গে আমি একথাও ঘোষণা করছি যে, বৃটিশ সরকার ইহুদীদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবে।" তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র উজীর আর্থার জেমস্ 'ব্যালফোর' এ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৩৭ সালে রয়েল ফিলিস্তিন কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদানকালে তৎকালীন বৃটিশ উজীরে আযম একথা স্বীকার করেন যে, ১ম বিশ্বযুদ্ধে ইহুদী সম্প্রদায় মিত্র শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করায় পুরস্কার স্বরূপ পূর্ব নির্ধারিত 'গুপ্ত চুক্তি' মুতাবিক বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি স্থাপনের আন্দোলন সমর্থন করে। অবশ্য উক্ত ঘোষণায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের রাষ্ট্র স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এ ঘোষণাটিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের নিয়ে এসে ফিলিস্তিনে জড় করতে শুরু করে। এদিকে ১৯২৩ সালে জাতিপুঞ্জ ফিলিস্তিনকে বৃটেনের অছিগিরিতে সমর্পণ করে।

ব্যালফোর ঘোষণার পর ইহুদীদের ফিলিস্তিন আমদানীর যে অভিযান শুরু হয়েছিল, ফিলিস্তিনে বৃটেনের অছিগিরি প্রাপ্তিতে সে অভিযান আরও জোরদার হল। ১৯১৮ সালে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের মোট সংখ্যার এক-দশমাংশ ছিল ইহুদী। এবং এদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। পরবর্তী বছর-গুলোতে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা নিম্ন হারে বেড়ে যায় ঃ

১৯১৯ সাল থেকে	১৯২৩ সাল পর্যন্ত	৩৫,০০০
১৯২৩ সাল থেকে	১৯৩১ সাল পর্যন্ত	৮১,০০০
১৯৩১ সাল থেকে	১৯৪১ সাল পর্যন্ত	২,৫০,০০০

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর লক্ষ লক্ষ যুদ্ধ বিধ্বস্ত গৃহহীন লোকদের পুনর্বাসনের সমস্যা দেখা দেয়। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ইহুদীও ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান তাঁর সমসাময়িক বৃটিশ উজীরে আযম মিঃ এট্‌লীর সঙ্গে পত্রালাপ করে ফিলিস্তিনে এক লক্ষ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইহুদীদের বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। মিঃ এট্‌লী এ বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিনিধিদের একটি যুক্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। মিঃ ট্রুম্যান এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

বারজন সদস্যের এ কমিটি ওয়াশিংটন, লণ্ডন এবং কায়রো সফর করে ইহুদী, মুসলিম ও খৃষ্টানদের বক্তব্য শোনেন। ১৯৪৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে যুগপৎ লণ্ডন ও ওয়াশিংটন থেকে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্টে ফিলিস্তিনে এক লাখ ইহুদীর বসবাসের ব্যবস্থা করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তবে কমিটির সুপারিশে স্পষ্টভাষায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ফিলিস্তিনে ইহুদী ও মুসলমান কেউ কারো উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। বরং ইহুদী, মুসলমান ও খৃষ্টান এ তিন জাতিরই ফিলিস্তিনে সমান অধিকার থাকবে।

রিপোর্টের শেষাংশে যে শর্তটি উল্লেখ করা হয় তার জন্য ইহুদী সংগঠন-গুলো এ রিপোর্টের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিপুল সংখ্যক ইহুদীর বসবাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আমেরিকায় ইহুদীদের স্থান দিতে এক সময় রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এসব প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এরা বৃটেনের অছিগিরির সুযোগে সমগ্র আরব জাহানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে আনয়নের অভিযান আরও জোরদার করে দেয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ছয় লাখ ইহুদীকে ফিলিস্তিনে এনে বসানো হয়।

এবার ইহুদী সম্প্রদায় ফিলিস্তিনে মজবুত হয়ে বসার ব্যবস্থা করে। বৃটিশের ছত্রছায়ায় ফিলিস্তিনে "হেগনা ও ইরগুন" নামে দু'টি সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র ইহুদী সংগঠন কায়েম হয় এবং এরা মুসলমানদের উপর নির্বিচারে যুলুম নির্যাতন শুরু করে দেয়। ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও খুন-খারাবী চরম আকার ধারণ করে। বৃটিশ সরকার অবশেষে বিষয়টি জাতিসংঘের নিকট পেশ করে দেয়।

১৯৪৭ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। ফিলিস্তিনের অবস্থা তদন্ত করে ঐ বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের নিকট এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করার জন্য এ অধিবেশনেই এগার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির সদস্য ছিল অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়েতেমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যাণ্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লোভিয়া। ইহুদী জাতি ঐ সময় চীৎকার করে ঘোষণা করতে শুরু করে যে, জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্তই করুক না কেন, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন প্রস্তাবেই এরা সম্মত হবে না। যথাসময়ে কমিটি রিপোর্ট প্রদান করে। ঐ রিপোর্টে কমিটির সদস্যগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু' ধরনের সুপারিশ করেছিলেন। কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, পেরু, গুয়েতেমালা, নেদারল্যাণ্ড ও উরুগুয়ে ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র কায়েম করার প্রস্তাব করে। আর ভারত, যুগোশ্লোভিয়া ও ইরান একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করার সুপারিশ করে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এ উভয় প্রস্তাব একটি এড্‌হক কমিটির নিকট সোপর্দ করে দেয়। এ কমিটিতে গুয়েতেমালা ও উরুগুয়ে ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার জন্য জোরদার ওকালতি শুরু করে। এদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রে গুয়েতেমালা ও উরুগুয়ের নামে অনেক রাস্তা-ঘাটের নামকরণ করা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তুমুল বিতর্কের পর ভোট গ্রহণ করা হয় এবং ২৯-১৩ ভোটে ফিলিস্তিন বিভক্তির প্রস্তাব পাশ হয়ে যায়। রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই বিভাগের পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে প্রস্তাবটি উত্তীর্ণ না হলে তা কার্যকরী হয় না বিধায় ১৯৪৭ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে বলে স্থির করা হয়। ঐ তারিখ পর্যন্ত অবস্থা ইহুদীদের অনুকূলে ছিল না। তাই বৃহৎ শক্তিগুলো নানা প্রকার টালবাহানা করে ভোট গ্রহণে বিলম্ব করতে থাকে। আর অপর দিকে ইহুদী নেতাগণ পৃথক পৃথকভাবে জাতিসংঘ সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে অবস্থা অনুকূলে আনয়নের জন্য প্রবল চেষ্টা শুরু করে দেয়। আমেরিকাও ঐ সময় ইহুদীদের অনুকূলে ভোটদানের জন্য সদস্য দেশগুলোকে চাপ দিতে থাকে।

২৯শে নভেম্বর পর্যন্ত ইহুদীদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ঐদিনই ৩৩-১৩ ভোটে ফিলিস্তিন বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১০টি দেশ ভোটদানে বিরত এবং একটি দেশ পরিষদে অনুপস্থিত ছিল। প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পরিষদে হাংগামা শুরু হয়ে যায় এবং এ গোলমালের মধ্যেই আরব রাষ্ট্রগুলো এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে তাদের অস্বীকৃতি ঘোষণা করে দেয়।

পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন রাশিয়া ও আমেরিকা ফিলিস্তিন বিভাগের ব্যাপারেই সর্বপ্রথম একমত হয়।

এ ফায়সালার পর ফিলিস্তিনে ইহুদীদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদলগুলো জোর জবরদস্তি করে মুসলমানদের বাড়ী-ঘর ও সংসার-সম্পত্তি দখল করে নেয়। জাতিসংঘ এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে ১৭ হাজার মুসলমান নিহত হয়। সমগ্র মুসলিম জাহান এ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। তাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিষয়টি সম্পর্কে পুনরালোচনা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধিই ফিলিস্তিন বিভাগ কার্যকরী করা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে ফিলিস্তিনকে সাময়িকভাবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আনয়নের প্রস্তাব পেশ করে। বেশ কিছু দিন যাবত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিষয়টি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার প্রহসন হয়।

১৪ই মে রাত বারোটায় ফিলিস্তিনে বৃটেনের অছিগিরি শেষ হয়ে যাবার মেয়াদ ছিল। তাই ঐ তারিখের মধ্যেই একটা ফায়সালা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এদিকে ইহুদী নেতা ওয়াইজম্যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যানের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে একটা নয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

১৪ই মে রাত ১২টায় ফিলিস্তিনে বৃটেনের অছিগিরির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ওয়াশিংটনের সময় মুতাবিক তখন সকাল ৬টা। এক মিনিট পরেই ইহুদী নেতা বেন গুরিয়ান স্বাধীন ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে এবং এর মাত্র দশ মিনিট পর ওয়াশিংটন সময় সকাল ৬টা ১১ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দান করে। ঠিক ঐ সময় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি কর্তৃক ফিলিস্তিনকে সাময়িকভাবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আনয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এদিকে শান্তি ও ন্যায়-নীতির অপর দাবীদার রাশিয়া আমেরিকার পরপরই ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দান করে। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জোর গলার দাবীদার দু'টি দেশ আরব মুসলিমদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ইসরাঈল রাষ্ট্রকে মুসলিম জাহানের বুকে বিষাক্ত ছুরির মতই বসিয়ে দেয়।

আরব মুসলিমগণ ইসরাঈলকে স্বীকার করে নিতে পারেনি, আজও নেয়নি। তাই বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ নয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা জিহাদ ঘোষণা করেন। মধ্যপ্রাচ্যের তৎকালীন শক্তিশালী ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমুন জান-মাল দিয়ে এ জিহাদে অংশগ্রহণ করে।

আট মাস কাল এ যুদ্ধ চলে এবং এরপর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ বিরতি হয়। যুদ্ধ বিরতি রেখার উভয় পার্শ্বেই জাতিসংঘের সৈন্য বাহিনী মোতায়েন করা হয়। নিজেদের বাড়ী-ঘর থেকে বিতাড়িত আরব মুসলমানদের বসবাসের জন্য জাতিসংঘ তাঁবু সরবরাহ করে এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য জাতিসংঘ তহবিল থেকে খোরপোষের ব্যবস্থাও হয়।

১৯৫৭ সালে জাতিসংঘের প্রকাশিত এক হিসেব থেকে জানা যায় যে, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে আরব মুহাজিরগণ নিম্নবর্ণিত সংখ্যায় জাতিসংঘের সাহায্য লাভ করেছেন ঃ

জর্দান ঃ	৫ লাখ	লেবানন ঃ	১½ লাখ
গাজা ঃ	৩ লাখ	সিরিয়া ঃ	১ লাখ।

এছাড়া ইরাক, মিসর, সউদী আরব এবং ইয়েমেনেও লাখ লাখ আরব মুহাজির ফিলিস্তিনে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় দিন গুণছেন। তাদের অনেক সন্তান-সন্ততি তাঁবুতেই জন্মেছে এবং তাঁবুতেই যৌবনে পদার্পণ করেছে। এদের সমগ্র জীবনই মুহাজির হিসেবে তাঁবুতে কেটে যাবে কিনা তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরও বিপুল সংখ্যক মুসলমান ফিলিস্তিনের ঘর-বাড়ী ছেড়ে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

বর্তমানে ইসরাঈল রাষ্ট্রের আওতায় যেসব মুসলিম বাসিন্দা রয়েছে তাদের অত্যন্ত কষ্টে দিনাতিপাত করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সমগ্র ইসরাঈলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে শাসনকার্য সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। সামরিক শাসকগণ দেশের বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব এলাকার মুসলমান অধিবাসীগণ সামরিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোথায়ও যেতে পারে না। এলাকার বাহির থেকে কোন আত্মীয়-স্বজনকে তাদের সঙ্গে দেখা করতেও দেয়া হয় না 'জনকল্যাণ' ও 'জননিরাপত্তা' নামে। সামরিক শাসকগণ যে কোন জমি বা সম্পত্তি দখল করে নেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। এ ক্ষমতা বলে মুসলমানদের চাষের জমি ও দোকান-পাট দখল করে নিয়ে ইহুদীদের দিয়ে দিচ্ছে। ইহুদীদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মুসলমান কর্মচারী ও শ্রমিকদের পাইকারী হারে বরখাস্ত করা হচ্ছে। যারা এখনও চাকরী হারায়নি তাদের বেতন অত্যন্ত কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

নানাবিধ ছুঁতা-নাতা তালাশ করে মুসলমানদের মারপিট ও দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করার অজুহাতে বিশেষ বিশেষ এলাকা থেকে মুসলমানদের বাড়ী-ঘর কেড়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মোদ্দাকথা ইসরাঈলের মুসলমান অধিবাসীগণ বর্তমানে বন্দী জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

মুসলিম জাহানে ইহুদী চক্রান্ত

তুর্কীর খিলাফতের উচ্ছেদ সাধনে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। খিলাফত উচ্ছেদ সাধনের মাত্র ২৬ বছর যেতে না যেতেই ফিলিস্তিনের অংশ বিশেষ ইহুদীদের দখলে চলে যায়। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের রাষ্ট্র স্থাপন এবং ক্রমে এর বিস্তার সাধন করে প্রায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দখল করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে দু'টি প্রধান অন্তরায় ছিল। প্রথমটি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী ইসলামী প্রতিষ্ঠান মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে মিসরে কাজ শুরু করেছিল—কিন্তু পরবর্তীকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম যুবসমাজ ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতে পুনরায় জেগে উঠে এবং ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত উপায়ে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ আন্দোলনের তৎপরতা ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে ইহুদী সম্প্রদায় ইখওয়ানুল মুসলিমুনকেই তাদের প্রধান শত্রু বিবেচনা করতে শুরু করে। আর ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলের সদস্য ও নেতৃবৃন্দ ১৯৪৮ সালের জিহাদে প্রমাণ করে দেন যে, সত্য সত্যই তাঁরা ইহুদীবাদের সাফল্যের পক্ষে কাঁটা স্বরূপ। ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্র স্থাপিত হবার পর আরব-মুসলিমগণ ইসরাঈলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। অর্ধ মাসকাল স্থায়ী এ জিহাদের পুরোভাগে ছিলেন ইখওয়ানের মুজাহীদবৃন্দ। তাঁদের নির্ভীক সংগ্রাম ও নজীরবিহীন কুরবানী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন ইত্যাদি বৃহৎ শক্তিবর্গ পরোক্ষভাবে ইসরাঈল রাষ্ট্রের সমর্থনে ছিল। কিন্তু তবু ইখওয়ান দল বিন্দুমাত্র শংকিত হয়নি। বজ্রকঠোর দৃঢ়তা নিয়ে তাঁরা এ জিহাদ চালিয়ে যান। অবশেষে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি সংঘটিত হলো। কিন্তু জাতিসংঘ সমস্যাটির কোন সমাধান পেশ করার পরিবর্তে গড়িমসি নীতি অবলম্বন করে ইহুদীদের ফিলিস্তিনে মজবুত হয়ে বসার সুযোগ দান করলো।

'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের চারিদিকে যেসব মুসিলম রাষ্ট্র রয়েছে তাদের কোনটিই ইসরাঈলকে স্বীকার করে নেয়নি। এ শক্তিগুলো একতাবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নেমে এলে ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ঐক্য। আর এজন্যই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি ইহুদী স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

ঠিক এ প্রয়োজনের সময়ই মিসরে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং বাদশাহ ফারুক দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বাদশাহ ফারুকের নানাবিধ দোষ থাকা সত্ত্বেও

তিনি সর্বদা আরব ঐক্যের প্রতি জোর দিতেন এবং মিসর ও সুদানের মধ্যে সখ্যতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আরবদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য খুবই জরুরী ছিল। তাই মিসরে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল ছড়ানো হয়েছিল। মিঃ এনড্রু টাল্লী (Andrew Tully) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক "সি-আই-এ ক্রেষ্ট বুক" (C.I.A. Crest Book) Fawcett Publications, Inc, New York 1963, 84-89 এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য পেশ করেছেন ঃ

"Anti Western feeling came to ahead in Oct. 1951, when Faruk's Govt. denounced the 1936 Treaty with Great Britain and moved to drive the British from the Suez canal zone and from Anglo Egyptian Sudan ...."

তরজমা ঃ "১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে বাদশাহ ফারুকের সরকার গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে সুয়েজ এলাকা ও ইংগ-মিসরীয় সুদান থেকে বৃটিশদের তাড়িয়ে দিতে উদ্যত হন এবং এ সময়ই পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠে ....।"

"It was probably at this time that the United States and Great Britain decided that Faruk would have to go. That is, both C.I.A. and British Intelligence began casting about for somebody to takeover."

তরজমা ঃ "খুব সম্ভব ঐ সময়ই যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন বাদশাহ ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর সি-আই-এ এবং বৃটিশ ইনটেলিজেন্স এক যোগে ক্ষমতায় বসানোর জন্য লোক অনুসন্ধান শুরু করে।"

"This was C.I.A. which had set a number of its skilled operatives to Cairo to keep a close watch on the weakning Faruk regime. Among these officers were former Army intelligence officers who had spent most of their careers in the Middle East and with whom Naser felt at home. C.I.A. gave the word late in July, and free officers corps swang into action."

তরজমা ঃ "ক্ষয়িষ্ণু ফারুক সরকারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সি-আই-এ একদল দক্ষ কর্মচারীকে কায়রোতে পাঠিয়ে দেয়। এসব লোকদের মধ্যে সামরিক বিভাগের গোয়েন্দা অফিসারগণ ছিলেন যারা তাদের জীবনের

বেশীর ভাগ সময় মধ্যপ্রাচ্যে কাটিয়েছেন এবং .... এর সঙ্গে যাদের খুবই সদ্ভাব ছিল। (১৯৫২ সালের) জুলাই মাসের শেষ ভাগে সি-আই-এ চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে দেয় এবং .... এর স্বাধীন অফিসার বাহিনী কর্মতৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।"

উল্লেখিত পুস্তকে এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বাদশাহ ফারুককে তাড়িয়ে দিয়ে মিসরে কিভাবে বিপ্লব এলো তার কিঞ্চিৎ আভাস দান করার জন্য উপরের তিনটি উদ্বৃতি যথেষ্ট মনে করি।

যাহোক, মিসরে বিপ্লব হলো, তারপর যা যা ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ ঃ

ইখওয়ান-নির্যাতন

১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। এ দলের দশ হাজার সদস্য গ্রেফতার হন। বিশ্ব বিখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ আবদুল কাদের আওদাহ (শহীদ) ও ইউসুফ তালাত প্রমুখ ৬জন বিশিষ্ট ইখওয়ান নেতাকে ফাঁসী দেয়া হয়।

ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের জেলে পূরে সমগ্র মিসরে ইসলাম বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং আল্লাহর নবীদের আক্রমণকারী ঘোষণা করে ফেরাউনকে মিসরের জাতীয় নেতা হিসেবে পেশ করা হলো। রাস্তা-ঘাট ও সরকারী অফিসে ফেরাউনের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। ফেরাউনের প্রতিমূর্তির পদতলে কুরআন ও বাইবেলের এক এক কপি স্থাপন করা হয়েছে। ডাকটিকেট ও মুদ্রায় ফেরাউনের প্রতিকৃতি ছাপিয়ে মিসরবাসীদের অভিশপ্ত ফেরাউনের পূজা করার জন্য তৈরী করা হয়েছে।

১৯৬৫ সালে পুনরায় ইখওয়ানদের পাইকারী হারে ধর-পাকড় শুরু হয়। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবরাদি থেকে জানা যায় যে, অন্যূন ৫০ হাজার ইখওয়ান সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ৮০০ মহিলাও এদের মধ্যে শামিল রয়েছেন। গ্রেফতারকৃত নেতা ও কর্মীদের উপর যেরূপ দৈহিক নির্যাতন করা হয় তা বর্ণনাতীত। শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এসব বন্দীদের অনেকেই দৈহিক নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে জেলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলের প্রধান নেতা সাইয়েদ হাসান ইসমাঈল আল হোদায়বী, সাইয়েদ কুতুবের ভাই মুহাম্মদ কুতুব ও তাঁরই ভগ্নী আমিনা কুতুব প্রমুখ ব্যক্তিগণ জেলে মৃত্যুবরণকারীদের অন্যতম। লণ্ডনে প্রকাশিত "জীউইশ অবজারভার" (Jewish Observer) পত্রিকার ২৮-১১-৬৫ তারিখের সংখ্যায় ইখওয়ানের উপর এ নির্যাতনের সংবাদটিকে 'সুখবর' (good news)

শিরোনামায় প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত খবর থেকে এও জানা যায় যে, ৪৫০০ ইখওয়ানকে দূরবর্তী এলাকায় নির্বাসিত করা হয়েছে। আজও ইখওয়ান সদস্যদের মুক্তি দেয়া হয়নি এবং অমানুষিক অত্যাচারে তাদের জর্জরিত করা হচ্ছে। নিছক রাজনৈতিক বিদ্বেষ এত চরম আকার ধারণ করতে পারে না। আর ইহুদীদের পত্রিকায় এসব খবর ছাপিয়ে আনন্দ প্রকাশ করাটাও বিবেচনার যোগ্য।

বাদশাহ ফারুকের শত দোষ ছিল। কিন্তু তবু তার শাসনামলে ইসলাম মিসরের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর নিজস্ব 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শকে উচ্ছেদ করার জন্য অর্থশক্তি নিয়োগ করেছেন। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে শাসকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফতোয়া দান করতে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রের গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে আভ্যন্তরীণ দিকে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টায় প্রেসিডেন্ট নাসের সম্পূর্ণরূপে সফলতা অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সম্পর্কে অনেক কিছুই আঁচ করা যায়।

মুসলিম জাহান ও নাসের

মুসলিম জাহানের সঙ্গে মিসর প্রধানের কখনও সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। বরং অবিরাম তিক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম জাহানকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করাই তিনি পসন্দ করে এসেছেন।

আরবী ভাষাভাষী মধ্যপ্রাচ্যকে সমগ্র মুসলিম জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য খৃষ্টান ও ইহুদীদের আবিষ্কৃত আরব জাতীয়তাবাদের ধুয়া কায়রো রেডিও থেকে প্রচার হতে থাকে। এমনকি প্রেসিডেন্ট নাসেরকে 'নাবীওল কওমিয়া' (জাতীয়তাবাদের নবী) আখ্যা দান করা হয়। আরব ঐক্যের নামে সর্বপ্রথম সিরিয়া ও মিসর সংযুক্ত হয়ে যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (UNITED ARAB REPUBLIC) সংক্ষেপে UAR কায়েম করে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এ মিতালী শত্রুতায় পরিণত হয় এবং সিরিয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইউ, এ, আর, নাম ধারণ করে আছে। এ বিষয়ে মিঃ শুকরী আল কুয়েত্‌লী (সিরিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও অধুনা বিযুক্ত যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট) বলেন, আমাদের ধর্ম ও ঐতিহ্যের বিপরীত আদর্শ ও ভাবধারা জোর করে চাপানোর চেষ্টা করার ফলেই সিরিয়া বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। বাদশাহ ফয়সল, জর্দানের বাদশাহ হোসেন, প্রেসিডেন্ট বরগুইবা এবং বাদশাহ হাসান (মরক্কো) প্রেসিডেন্ট নাসেরের দুশমন। কায়রো রেডিও রাতদিন এদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

লিবিয়ার বাদশাহ ইদ্রিস সার্দাই মিসরের শাসনকর্তা থেকে দু' হাত দূরে থাকা পসন্দ করেন। কুয়েত সহ আরবী ভাষাভাষী ছোট ছোট শেখ শাসিত রাজ্যগুলো সর্বদা নাসেরের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। ইরাকের রক্তক্ষয়ী বিপ্লব কায়রো বেতারে অভিনন্দিত হয়েছে। জর্দানে ইসরাঈলদের বোমা বর্ষণের সুযোগে বাদশাহ হোসেনকে সিংহাসন চ্যুত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। ইয়ামিনে মিসরের ৬০ হাজার সৈন্য আরবী ভাষাভাষী মুসলমানদের রক্তপাত ঘটিয়েছে। আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময়ও এদের প্রত্যাহার করা হয়নি। দশ হাজার মিসরীয় সৈন্যসহ ইয়েমেনে এক লাখ মুসলমান নিহত হয়েছে।

সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময়ও প্রেসিডেন্ট নাসের কোন আরব রাষ্ট্র প্রধানের সাথে পরামর্শ বা যুক্ত কমাণ্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ফলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও যোগাযোগ বিহীন যুদ্ধের ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। মিসর প্রধানের এসব কার্যকলাপের দরুন ইহুদী শক্তিই ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং আরব মুসলিম জাহানের বুকে এ বিষাক্ত ফোঁড়া ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে।

পুনরায় কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে পাক-ভারত বিরোধে প্রেসিডেন্ট নাসের ভারতের পক্ষে। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে প্রেসিডেন্ট নাসের এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন, "ইসলামী ঐক্যের ধুয়া যতদিন তোলা হবে ততদিন আরব ঐক্য সম্ভবপর হবে না।" মজার ব্যাপার এই যে, ঐ বছরেরই মে মাসে মিসরীয় পার্লামেন্টে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে রাশিয়ার উজীরে আযম কোসিগিন 'ইসলামী ঐক্যের আওয়াজকে' দুনিয়ার মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন।

ভারতে পানির চেয়েও সহজে মুসলমানের রক্তপাত ঘটানো হয়। অথচ ভারত মিসরের খুব প্রিয় বন্ধু।

সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিস মুসলমানদের প্রতি চরম নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ সাইপ্রাস মিসরের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ।

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলিসেলাসী মুসলমানদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে এবং নির্মম অত্যাচারের দাপটে মুসলমানদের খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করছে। অথচ মিসর প্রধান তাঁর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। কর্নেল নাসেরের এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে মুসলমানদের বা আরবদের কোনই লাভ হচ্ছে না। বরং ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদেরই ফায়দা হচ্ছে। সম্প্রতি মিসরের পররাষ্ট্র উজীর কর্তৃক ইসরাঈলকে স্বীকার করে নেবার মনোভাব প্রকাশ করার পর মিসর সরকারের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন হতে পারে ইহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই কেন ? এর জবাব অত্যন্ত স্পষ্ট। তাড়াহুড়া করে ইহুদীদের সঙ্গে লড়াই বাঁধিয়ে ইহুদীদেরই সুবিধা করে দেয়া হয়েছে। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধে ইসরাঈল রাষ্ট্রেরই সুবিধা হয়েছিল। ইসরাঈল ঐ সময় 'ইলাত' দখল করে সামুদ্রিক বন্দর নির্মাণ করেছিল। আর সুয়েজের বিজয় ? আমেরিকা ও রাশিয়া এক যোগে সুয়েজ এলাকা থেকে ইংরেজদের বের করে দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য কায়েম করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সুয়েজ বিজয়ে প্রেসিডেন্ট নাসেরের কৃতিত্ব নেই। সে ঘটনা উপলক্ষ করে রাশিয়া মিসরে প্রভাব বিস্তার করেছে মাত্র। আর রাশিয়ার প্রভাবেই ইখওয়ানদের ধ্বংস করে দেয়ার ফলে ইসরাঈল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি জানানোর জন্য মিসর সরকার রাজী হয়ে গেছে। ইহুদী ষড়যন্ত্রের কায়দা-কানুন সম্বলিত প্রটোকোল পুস্তক পাঠ করে জানা যায় যে, মুসলমান দেশগুলোতে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে তা ইহুদীদেরই পরিকল্পিত। নিম্নে আমরা প্রটোকোল পুস্তকের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয় পেশ করছি ঃ

(১) ধর্মের প্রতি যুবসমাজকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা এবং ধর্ম নেতাদের বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করা।

(২) শরাব, জুয়া, সিনেমা ইত্যাদির নেশায় যুবসমাজকে উন্মাদ করে তোলা এবং নাইটক্লাব ও সোসাইটি লেডীদের (Society Lady) মাধ্যমে নৈতিক উচ্ছৃংখলতার উৎসাহ দান।

(৩) পুঁজিবাদী অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি এবং শ্রমিক আন্দোলনের নামে সমাজের শান্তি ও শৃংখলা নষ্ট করা।

(৪) এক নায়কত্ববাদী শাসনের মাধ্যমে জনগণ ও সরকারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি।

(৫) মুসলিম রাষ্ট্র-নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে তাদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত করা।

এই বইয়ের শেষাংশে প্রটোকোল পুস্তকের তরজমা সংযুক্ত হলো। তাই ইহুদী ষড়যন্ত্রের দীর্ঘ ফিরিস্তি এখানে পেশ না করে মাত্র প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় পেশ করা হলো। পাঠকবৃন্দ মুসলিম জাহানের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে।

বিশ্বব্যাপী ইহুদী চক্রান্ত

প্রটোকোল বইখানা ইহুদীদের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রেরই কায়দা-কানুন। যেহেতু উক্ত বইয়ের তরজমাও এ পুস্তকের শেষাংশে সংযোজিত হচ্ছে এজন্য

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই। প্রটোকোল নিজেই ইহুদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে স্পষ্ট সাক্ষী দিবে। মে, ১৯১৮ সালের উর্দু ডাইজেষ্ট পত্রিকায় "আল ইয়াহুদু আ'লমী" নামক আরবী পুস্তকের তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, ইহুদী জাতি সমগ্র দুনিয়ায় চক্রান্ত জাল ছড়ানোর জন্য একাধিক গুপ্ত সংস্থা কায়েম করে রেখেছে। এদের একটি প্রতিষ্ঠান KAHAL (কাহাল) নামে পরিচিত। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদীদের জন্য এ সংস্থাই নির্দেশ জারী এবং নানা ধরনের ট্রেনিংও দিয়ে থাকে। এটাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি পৃথক রাষ্ট্র বলা চলে। ইহুদী জাতির অন্তর্ভুক্ত পুঁজিপতি, শ্রমিক, সর্বহারা, সমাজতন্ত্রী ইত্যাদি সকল ধরনের লোকই এ সংস্থার সদস্য। এরা সকলেই অন-ইহুদীদের পর্যুদস্তু করার উদ্দেশ্যে জারীকৃত কাহালের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এমনকি কোন পুঁজিপতি ইহুদী অন-ইহুদীর হাতে নাজেহাল হলে কুমনিষ্ট ইহুদী পুঁজিপতি ইহুদীদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। ১৯০৬ সালে নিউইয়র্কে কাহাল গঠিত হয়। ধর্মযাজক, রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহল থেকে ২২২জন প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে কাহালের অধীনে এক হাজারেরও বেশী সংখ্যক উপসংস্থা কায়েম হয়ে যায়।

১৯১৮ সালে কাহালের সম্মেলনে ইহুদীদের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। বিনইয়ামীন শালী ফারীজার নামীয় জনৈক রুশীয় ইহুদী মস্কো থেকে এ সম্মেলনে যোগদান করে। এ ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত লেলিনের মন্ত্রী ছিল। এ ছাড়া রাশিয়া থেকে কয়েকজন কমুনিষ্ট শ্রমিক নেতাও ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন।

দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে, জীউইশ এজেন্সী (Jewish Agency)। এটিও ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছে। উভয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী প্রায় একই। ইহুদীদল ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত রয়েছে—অন-ইহুদীদের মনে এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার জন্যই সম্ভবত দু'টি পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। জীউইশ এজেন্সী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১২টি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন প্রভাবশালী ইহুদী কর্মকর্তা নিয়োগ করে রেখেছে। এ সংস্থায় আমেরিকার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, বিচারপতি, পুলিশ অফিসার, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, ব্যাংকের ডাইরেক্টর, শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতা শামিল রয়েছেন। এ দু'টি সংস্থা বর্তমানে নিম্নবর্ণিত তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে ঃ

(১) যেসব দেশে ইহুদী বাসিন্দা রয়েছে সেসব দেশে মজবুত প্রতিষ্ঠান গঠন করে ইহুদীদের সংঘবদ্ধ করা।

(২) অন-ইহুদী ও ইহুদী বিরোধীদের সর্বপ্রকার ক্ষতি সাধন।

(৩) অন-ইহুদীদের উপর ইহুদীদের পরিপূর্ণ প্রাধান্য কায়েম করা।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিপুল সংখ্যক ইহুদী বাস করে। সংবাদ পত্র, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, শিল্প, ব্যবসায়, ব্যাংক ইত্যাদি সর্বস্তরে ইহুদীদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট, হোয়াইট হাউজ, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিস ইত্যাদি সকল স্থানে ইহুদীদের প্রভাব রয়েছে।

রাথ্স্চাইলড্ খান্দান বিপুল ধন-সম্পদের প্রভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। আমেরিকার আযাদী আন্দোলনে এ পরিবার বিস্তর অর্থ খরচ করেছে। পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়ে ২০ লাখ ডলার উপার্জন করেছে। রাথ্স্চাইলডের ৫ পুত্র ছিল ঃ (১) আমানুস্লাম ফ্রাংক ফোরটে, (২) সলোমনে ভিয়েনায়, (৩) নান্ মায়ার লণ্ডনে, (৪) চার্লস্ নেপেলসে এবং (৫) জেম্স প্যারিসে বাস করতো। ইউরোপে অনুষ্ঠিত সকল যুদ্ধের এরাই ছিল প্রকৃত নেতা। এদের মৃত্যুর পর এ খান্দানের পরবর্তী বংশধরগণ এ নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে।

এদের কৌশল খুবই অদ্ভুত। যুদ্ধের উস্কানী এরাই দেয়। যুদ্ধ শুরু হলে বিবদমান পক্ষদ্বয়কে এরাই সমর্থন করে এবং ধার-কর্জ দিয়ে সাহায্য করে। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার সময়ও তথায় উপস্থিত থাকে এবং নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে সন্ধিপত্রে এমন সব দফা সংযোজিত করে যেন এদের দেয় ঋণ সুদ সহ আদায় করা সম্ভব হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যোগদান করতে চায়নি। ইহুদীরাই আমেরিকাকে যুদ্ধে টেনে নামিয়েছে। প্রেসিডেন্ট উইলসনের ব্যক্তিগত বন্ধু ও হোয়াইট হাউজের সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী ইহুদী বানার্ড বাররুখই আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য করে এবং এ যুদ্ধের সময় বাররুখ প্রকৃতপক্ষে সে দেশের ডিক্টেটর ছিল।

যুদ্ধ শেষে ভার্সাই নামক স্থানে বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে সন্ধিচুক্তি হয় সে বৈঠকেও বাররুখ যোগদান করে। এমনকি ৪জন উজীরে আযমের মধ্যে অনুষ্ঠিত গুপ্ত বৈঠকে পর্যন্ত বাররুখ যোগদান করেছিল।

এবার রাশিয়ার ভেতরের অবস্থা দেখতে হচ্ছে। Muslim News International মাসিক পত্রিকার মার্চ ১৯৬৭ সংখ্যায় বিখ্যাত আলেম ও রাজনীতিবিদ জনাব মাওলানা জাফর আহমদ আনছারী এম, এ, সাহেবের রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, রাশিয়ার সাম্যবাদও ইহুদী ষড়যন্ত্রেরই

অপর একটি দিক মাত্র। যেসব তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এ অভিমত পেশ করেছেন সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

(১) কমুনিষ্ট আন্দোলনের মূলে যাদের মন-মগজ কাজ করেছে তাদের সকলেই ইহুদী। কমুনিজমের জন্মদাতা কার্লমার্কস (Karl Marks) মাতাপিতা উভয়ের দিক থেকেই ইহুদী। লেলিন এবং ট্রটস্কিও ইহুদী বংশেরই সন্তান। লেলিনের মা এবং ষ্ট্যালিনের স্ত্রী ইহুদী ছিল।

(২) রুশীয় বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে ইহুদী সম্প্রদায় নানাবিধ চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর লেনিন এবং তার দু'শো কমরেড জার্মান থেকে একটি রেলগাড়ীতে চড়ে গোপনে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন। এ দু'শো কমরেডের মধ্য থেকে ১৬৫জনের নামের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। উক্ত তালিকা থেকে জানা যায় যে, ১৬৫জনের মধ্যে ১২৬জনই ছিল ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। লেনিনের রাশিয়া প্রবেশের অব্যবহিত পরেই আমেরিকার ৩০০ ইহুদীকে নিয়ে ট্রটস্কিও সেখানে পৌঁছে যান। তারপরে তারা সকলে মিলে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিপ্লব বাস্তবায়নের কাজ করেছিল।

(৩) বলশেভিক দল রাশিয়ার শাসন ক্ষমতা দখল করার পরে শাসন যন্ত্র ইহুদীদের হাতে চলে যায়।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শাসন যন্ত্রের ৫৫৬টি গুরুত্বপূর্ণ পদের ৪৫৭টিই ইহুদীদের করায়ত্ব ছিল।

(৪) ইহুদী লেখকগণ রুশীয় বিপ্লবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আলেকজাণ্ডার বিটলমান (Alexander Bittleman) তাঁর The Jewish people face the postwar world নামক পুস্তকে রাশিয়ায় কমুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থাকে নিম্নের ভাষায় অভিনন্দন জানাচ্ছে ঃ

If not for the Red Army, there would be no Jews in Europe today, not in Palastine, not in Africa and in the United States of America, the length of our existence would be counted in days ...The Soviet Unions State saved the Jewish people, therefore. let the American Jewish masses never forget our historic debt to the saviour of the Jewish people of the Soviet Union.

অর্থাৎ "লাল ফৌজের সাহায্য ছাড়া বর্তমানে ইউরোপ, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকায় ইহুদীদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আমাদের জাতীয় আয়ূ সীমিত হয়ে আসতো ... তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী অধিবাসিগণ যেন কখনও রুশীয় ইহুদীদের মহানুভবতা ভুলে না যায়।"

'আল ইয়াহুদুল আ'লমী' পুস্তকে ইহুদীদের বিশ্বব্যাপী চক্রান্তকারী অপর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে 'জামেয়া ইয়াহুদা'। দুনিয়ার সকল দেশেই এর শাখা রয়েছে এবং আরো দু'টি শক্তিশালী হাতিয়ার এদের কুক্ষিগত রয়েছে। এর একটি হলো সম্পদ এবং অপরটি হচ্ছে সাংবাদিকতা। 'জামেয়া ইয়াহুদা' ১৯১৪ সালে প্যারিসে কায়েম হয়। পরে এর সদর দফতর লণ্ডনে চলে যায়। বর্তমানে এর কেন্দ্রস্থল হচ্ছে নিউইয়র্ক এবং সেখান থেকেই বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ানো হয়।

জাতিসংঘ

জাতিসংঘের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ বিশ্ব সংস্থাটিও ইহুদীদেরই হাতের পুতুল মাত্র। বিশ্ব শান্তির নামে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানটি এ যাবত ইহুদী স্বার্থেরই হেফাজত করে আসছে। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ইহুদী আইন ব্যবসায়ী হেনরী ক্লায়েন (Henry Klien) তদীয় পুস্তক Zions rule the world New York. 1948-এর একস্থানে লিখেছেন ঃ

"The United Nations is Zionism. It is the super government mentioned many times in the protocols of the Learned Elders of Zion promulgated between 1897-1905."

অর্থাৎ "জাতিসংঘও ইহুদীবাদেরই নামান্তর মাত্র। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে জারীকৃত বিজ্ঞ ইহুদীবাদী মুরুব্বীদের প্রোটোকোল পুস্তকে পুনঃপুনঃ যে সুপার গভর্নমেন্টের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এটা তাই।"

বিশেষ করে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের উড়ে এসে জুড়ে বসার সুযোগদান, ১৯৪৮ সালে অন্যায়ভাবে জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিন বিভক্তির প্রস্তাব গ্রহণ এবং ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত আরব ইসরাঈল যুদ্ধের পর ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত মুসলিম মুহাজিরদের পুনর্বাসনের প্রতি জাতিসংঘের ঔদাসীন্য ইত্যাদি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতিসংঘ ইহুদীদেরই পক্ষে কাজ করছে।

লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক "এশিয়া" পত্রিকার ১৬-৭-৬৭ তারিখের সংখ্যায় জাতিসংঘে ইহুদীদের প্রভাব সম্পর্কে যে খবর বের হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, জাতিসংঘের ৭৩টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে ইহুদী অফিসার সমাসীন রয়েছে। জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েটে ২২টি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ইহুদী। নিম্নবর্ণিত জাতিসংঘ শাখা কমিটিগুলোতেও সর্বোচ্চ পদগুলো ইহুদীদের দখলে রয়েছে।

১। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION সংক্ষেপে UNESCO.)—৯টি।

২। আন্তর্জাতিক সংস্থা (ILO)—৩টি
৩। আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)—৩টি
৪। বিশ্বব্যাংক (World Bank)—৬ঠি
৫। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্পোরেশন (IFC)—৯টি।

এ ছাড়াও জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েটে নিম্নতর দায়িত্বে অসংখ্য ইহুদী রয়েছে এবং তারা একটি পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছে বলে ঐ একই খবরে প্রকাশ। সুতরাং জাতিসংঘও যে ইহুদীদেরই ইঙ্গিতে উঠা-বসা করবে তাতে সন্দেহ কি ! চক্রান্ত বিশারদ ইহুদী সম্প্রদায় একটি ব্যাপক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা মাফিক দুনিয়ার সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে চলছে এবং প্রটোকোলে বর্ণিত বিশ্বব্যাপী ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহুদীদের সংখ্যা

দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ইহুদী জাতি বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। প্রোটোকোল পুস্তকে তাদের এ অবস্থাকে ইহুদীদের জন্য একটা বিশেষ সুবিধা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে থাকার দরুন এদের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশের ইহুদী আর্যবাসীদের মাধ্যমেই ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করার সুযোগ পায়। নিম্নে ইহুদীদের জনশক্তি সম্পর্কে একটা মোটামুটি হিসেব দেয়া হলো। এ হিসেব থেকে জানা যায় যে, আমেরিকা এবং রাশিয়ায় বিপুল সংখ্যক ইহুদী বাস করে। নিউইয়র্ক শহরের অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক বাসিন্দা ইহুদী। এ জন্যে এ শহরটিকে কোন কোন সময় 'জিউ ইয়র্ক'ও (Jew York) বলা হয়।

দেশের নাম	ইহুদী অধিবাসীর সংখ্যা	দেশের নাম	ইহুদী অধিবাসীর সংখ্যা
আমেরিকা	৫৬,৬০,০০০	তুর্কী	৪৪,০০০
রাশিয়া	৩০,০০,০০০	বেলজিয়াম	৩৫,০০০
ফ্রান্স	৫,০০,০০০	চিলি	৩৫,০০০
আর্জেন্টিনা	৪,৭৫,০০০	ইটালী	৩৫,০০০
বৃটেন	৪,৫০,০০০	মেক্সিকো	৩০,০০০
ক্যানাডা	২,৭০,৫০০	পশ্চিম জার্মানী	৮৫,৮০০
ব্রাজিল	১,২৫,০০০	তিউনিসিয়া	২৫,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১,১৬,০০০	হল্যাণ্ড	২২,০০০

দেশের নাম	ইহুদী অধিবাসীর সংখ্যা	দেশের নাম	ইহুদী অধিবাসীর সংখ্যা
রুমানিয়া	১,০০,০০০	হল্যাণ্ড	২০,০০০
হাঙ্গেরী	৮০,০০০	সুইজারল্যাণ্ড	১৯,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	৬২,০০০	চেকোশ্লোভাকিয়া	১৪,০০০
উরুগুয়ে	৫০,০০০	ইথিওপিয়া	১৫,০০০
মরক্কো	৫০,০০০	ভারত	১৪,৪৫০
সুইডেন	১৩,০০০	ফিনল্যাণ্ড	১,৭০০
অষ্ট্রীয়া	১২,০০০	কোষ্টারিকা	১,৫০০
লুক্সেমবার্গ	১২,০০০	জামাইকা	৯০০
বেতর ভিলা	১১,০০০	জাপান	৮০০
কোলম্বিয়া	১১,০০০	পর্তুগাল	৭০০
যুগোশ্লোভিয়া	৬,০০০	জিব্রাল্টার	৬,৫০০
গ্রীস	৬,০০০	পাকিস্তান	৭০০
বুলগেরিয়া	৬,০০০	ডোমিনিকা	৫৫০
ইরাক	৬,০০০	সিঙ্গাপুর	৫০০
লেবানন	৫,৫০০	পূর্বজার্মানী	৪৫০
স্পেন	৫,০০০	এলসালভাদর	৩০০
নিউজিল্যাণ্ড	৫,০০০	ফিলিপাইন	২৫০
সিরিয়া	৫,০০০	এডেন	২৫০
লিবিয়া	৪,২০০	নিকারাগুয়া	২০০
বলিভিয়া	৪,০০০	সুদান	২০০
আলজিরিয়া	৩,৫০০	ইন্দোনেশিয়া	২০০
মিসর	২,৫০০	হণ্ডুরাস	১৫০
কিউবা	২,০০০	হংকং	২০০
পানামা	২,০০০	গিনি	৫০
গুয়েতেমালা	১,৫০০	কিউবা	৫০
ইউলিয়র	১,২০০	লালচীন	২০
নরওয়ে	১,০০০		

(উর্দু সাপ্তাহিক 'এশিয়া' লাহোর, ৬-৮-৬৭ইং)

বিভিন্ন সমিতির ছদ্মাবরণে ইহুদী

ইহুদী সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে অন-ইহুদী দেশসমূহে বিভিন্ন নামে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান বা জনকল্যাণমূলক কাজের বাহানায় ক্লাব ও

সমিতি গঠন করে এবং অতি সংগোপনে ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা চালিয়ে যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফ্রিম্যাসন আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রটোকোল বইতেও 'ফ্রিম্যাসন' আন্দোলনকে ইহুদীদের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা নিম্নে এ আন্দোলনের কিছুটা পরিচয় পেশ করছি ঃ

ফ্রিম্যাসন আন্দোলন (Free Mason Movement)—ম্যাসন (Mason) শব্দের অর্থ রাজমিস্ত্রী। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে হযরত সুলাইমান (আ) স্মৃতি রক্ষার্থে রাজমিস্ত্রীদের একটি গোত্র মিসরে "মা'বাদে সুলাইমানীর" ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। নানাবিধ বাধা-বিপত্তির মধ্যে একাজ করতে হয়েছিল—তাই কাজটি খুব আত্মগোপনেই সম্পন্ন করা হয়। এ অট্টালিকার প্রধান রাজমিস্ত্রীর নাম ছিল হিরাম আবিফ (Hiram Abiff)। দুশমনদের অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি এ উপাসনালয়ের পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি। এ জন্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন—কিন্তু গৃহটির গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেননি। সে রাজমিস্ত্রীর অনুকরণে গোপনীয়তা রক্ষা করে একটি দুনিয়া জোড়া আন্দোলন পরিচালনা করার মতলবেই ইহুদীগণ তাদের এ আন্দোলনের নাম দিয়েছে ফ্রিম্যাসন।

১৭১৭ ঈসায়ী সালে লণ্ডনে ফ্রিম্যাসন আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। এর সদস্যগণ যে স্থানে একত্রিত হয় তাকে ফ্রিম্যাসন লজ (Free Mason Lodge) বলা হয়।

২৪-৬-১৭১৭ তারিখে লণ্ডনের ৪টি 'লজ'-এর সমন্বয়ে ইউনাইটেড গ্র্যাণ্ড লজ (UNITED GRAND LODGE) কায়েম হয়। ১৭২৬ সালে গ্র্যাণ্ড লজ অব আয়ারল্যাণ্ড এবং ১৭৩৬ সালে গ্র্যাণ্ড লজ অব স্কটল্যাণ্ড কায়েম হয়। দুনিয়ার অসংখ্য লজ, এ তিনটি গ্রাণ্ড লজের অধীন। তবে বেশী সংখ্যক লজই লণ্ডনের ইউনাইটেড গ্রাণ্ড লজের অধীন। 'লজ'গুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে ১০-৯-৬৭ইং তারিখে সাপ্তাহিক জাহানে নও (ঢাকা) পত্রিকায় নিম্নের তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে ঃ

ঈসায়ী ১৭৩৩ সালে জার্মানীতে, ১৭৩৫ সালে পর্তুগাল ও হল্যাণ্ডে, ১৭৪০ সালে সুইজারল্যাণ্ডে, ১৭৪৫ সালে ডেনমার্কে, ১৭৬০ সালে ইটালীতে, ১৭৬৫ সালে বেলজিয়ামে, ১৭৭১ সালে রাশিয়াতে, ১৭৭৩ সালে সুইডেনে, ১৭৪২ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও জামাইকাতে, ১৭২৮ সালে ইটিগুয়া, ১৭২৫ সালে ফ্রান্সে, ১৭৩৮ সালে মাদ্রিদে ও ১৭২৯ সালে জিব্রাল্‌টারে এর শাখা কায়েম করা হয়। এই সমস্ত জায়গার প্রচলিত আন্দোলনকে পরিচালিত করার জন্যে কেন্দ্রীয়ভাবে আগে থেকেই পূর্বোক্ত তিনটি গ্র্যাণ্ডলজ প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

পাক-ভারত উপমহাদেশে—১৭২৯ সালে কলকাতায় ফোর্টউইলিয়ামে প্রথম একটি লজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতপর ১৭৫৩ সালে মাদ্রাজে ও ১৭৫৮ সালে বোম্বেইতে প্রসার লাভ করে। ১৮৫৯ সালে পাকিস্তানে সর্বপ্রথম এর শাখা লাহোর শহরের আনারকলীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ সালের ৪ঠা এপ্রিলের ভূমিকম্পে আনারকলীর পার্শ্ববর্তী দালান ধ্বসে পড়ায় ফ্রিম্যাসন্স হলটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পরে তা আবার ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে নির্মিত হয়। এর ছয় বছর আগে (অর্থাৎ ১৯১০ সালে বাংলাদেশে) ঢাকা শহরের পুরানা পল্টনে (বাস ষ্টেশন সংলগ্ন পূর্বপার্শ্বে) এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সামান্য কয়েক বছর পরই চাটগাঁ ও প্রদেশের আরো দু' একটি শহরে নিয়মিতভাবে এর কাজ-কর্ম শুরু হয়। পাকিস্তানে হায়দারাবাদ, কোয়েটা, মুলতান, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারে এর শাখা রয়েছে। বর্তমানে করাচীতে ২০টি এবং লাহোরে এ ধরনের ৩টি গুপ্ত লজ রয়েছে বলে জানা যায়। এ সবগুলো শাখাই গ্রাণ্ডলজ অব ইংলণ্ডের অধীনে কাজ করে।

সংখ্যা ও তৎপরতা—১৯৫২ সালে তিনটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে শাখা সংখ্যা ছিলো নয় হাজার। এগুলো ছাড়াও তখন আমেরিকার শাখা সংখ্যা ছিলো ৫৯।

বর্তমানে সারা দুনিয়াতে ম্যাসনের সদস্য ৬০ লাখেরও কিছু বেশী বলে জানা গেছে। বিভিন্ন দেশে এদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সত্যিই উদ্বেগজনক। ১৯২৮ সালে বৃটেনে ৪৩ হাজার, ফ্রান্সে ৫ হাজার, ইটালীতে ৩৫ হাজার, সুইডেন এ নরওয়েতে ৩১ হাজার 'ম্যাসন' ছিলো। ১৯৫২ সালে শুধু মাত্র আমেরিকাতেই এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ লক্ষের ওপর। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিগত ১৩জন প্রেসিডেন্টই ছিলেন ইহুদী এবং ম্যাসন সদস্য। এরপর ১৯৬০ সালে যদিও শাখা-সংখ্যা তেমন বাড়েনি তবুও সদস্য সংখ্যা অনেক বেড়েছে, সন্দেহ নেই।

এর সদস্য পদ অত্যন্ত সীমিত ! সদস্য পদপ্রার্থীকে একজন পুরাতন সদস্যের নৈকট্য লাভ করতে হয়। ঐ পুরাতন সদস্য কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে গ্রহণের যোগ্য বিবেচনা করলে 'লজের' সাধারণ অধিবেশনে উক্ত প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করবে এবং অপর একজন সদস্য তা সমর্থন করবে। অন্যান্য সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপনকারী ও সমর্থক সদস্যকে নানাবিধ জেরা করার পর সন্তোষজনক জবাব পেলে সদস্য পদপ্রার্থীকে কোন প্রকাশ্য অধিবেশনে ডাকা হবে। সেদিন সকল সদস্য তাকে ভাল করে দেখে নিবে এবং তার পরিচয় গ্রহণ করবে। তারপর বেশ কিছুদিন যাবত সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে সদস্য পদপ্রার্থী সম্পর্কে গোপনে খবরাখবর সংগ্রহ করবে। অবশেষে এক দিন এ বিষয়ে

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক সদস্যকে কালো ও সাদা রং-এর দু'টি করে কাঠের তৈরী গুলী দেয়া হয়। পার্শ্ববর্তী একটি কামরায় দু'টি বাক্স থাকে। একটি বাক্সে লেখা থাকবে ব্যালট (Ballot)। আর অপরটিতে ওয়েষ্ট (Waste)। সাদা গুলীটির অর্থ 'হাঁ' আর কালোটি 'না'। সদস্যগণ একের পর এক পার্শ্ববর্তী কামরায় গিয়ে হাতের গুলী দু'টি নিজের ইচ্ছামত বাক্স দু'টিতে ভাগ করে রেখে আসে। কিন্তু কোন সদস্যই অপর সদস্যের ভোট সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। অবশেষে ভোট গণনা করা হয়। ব্যালটের বাক্সে সব সাদা গুলী পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সদস্য করে নেয়া হয়। যদি এর মধ্যে একটি কালো গুলী পাওয়া যায় তাহলে সেক্রেটারী ব্যালট বাক্সে কালো গুলী নিক্ষেপকারীকে গোপনে গোপনে খুঁজে বের করেন এবং তাঁর কাছ থেকে 'না' সূচক ভোটদানের কারণ জেনে নেন। যদি গুরুতর ধরনের আপত্তিকর কোন কারণ না থাকে তাহলে প্রার্থীকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যে প্রার্থীর ব্যালট বাক্সে দু'টি কালো গুলী পাওয়া যাবে তাকে কিছুতেই সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে না।

'লজের' সমস্ত রেকর্ডপত্র, বৈঠকের কার্যবিবরণী অত্যন্ত গোপনভাবে সংরক্ষিত হয়। ফ্রিম্যাসনের সদস্য ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ঘুণাক্ষরেও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু জানার উপায় নেই। নূতন কোন 'লজ' কায়েম করার আগে 'গ্র্যাণ্ডলজ' (লণ্ডন) থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। His highness right honourable lord grand Master of the grand lodge of England (উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন, মহাসম্মানিত লণ্ডনের গ্রাণ্ড লজের' মহান মাষ্টার) নূতন লজ কায়েম করার অনুমতি দেন। নয়া সদস্যকে 'লজে' সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে আসন গ্রহণ করতে হয়। সে সময় তাকে নিজের পোশাকের পরিবর্তন করে লজের বিশেষ পোশাক পরিধান করে চোখ বাঁধা অবস্থায় শুধু বাম পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে হয়। তার এক হাত পবিত্র গ্রন্থের উপরে থাকে এবং অপর হাত একখানা কম্পাস ধরা থাকে। কম্পাসের একটি কাঁটা খোলা বুকে চামড়ার উপর লাগানো অবস্থায় দাঁড়িয়ে সদস্যকে উচ্চস্বরে নিম্নের শপথবাণী উচ্চারণ করতে হয়ঃ "আমি শপথ করে বলছি যে, আমি কখনও সজ্ঞানে ফ্রিম্যাসনারীর গুপ্ত তথ্য ও রহস্যাবলী ফাঁস করবো না এবং প্রাচীনকাল হতে আমরা যেসব গুপ্ত জ্ঞান ও কলাকৌশল গোপনে গোপনে হাসেল করে আসছি তা সংরক্ষণ করার জন্যে পূর্ণরূপে চেষ্টা করবো। যদি আমি এ শপথ ভঙ্গ করি তাহলে যেন আমার গলার রগ কেটে দেয়া হয়, আমার জিহ্বা টেনে বের করে ফেলা হয় এবং আমি যেন সমুদ্রের অতল তলায় তলিয়ে যাই।" প্রতিটি নূতন সদস্যের উপর প্রথমে খুব কড়া নজর রাখা হয় যেন এরা ফ্রিম্যাসনারীর উদ্দেশ্যের বিপরীত কোন কাজে লিপ্ত হতে না পারে।

ফ্রিম্যাসন লজের সদস্যগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ফ্রিম্যাসনদের ভাষায় এ শ্রেণীকে বলা হয় 'ডিগ্রী'। ১ম, ২য়, ৩য় এভাবে ৩৩টি ডিগ্রী রয়েছে। এক ডিগ্রীর সদস্যবৃন্দ অপর ডিগ্রীর সদস্যদের পরিচয় ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। সদস্য পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হলে পরবর্তী ডিগ্রীতে পদোন্নতি লাভ করে এবং তখনই ঐ ডিগ্রীর গুপ্ত তথ্যাবলী জানতে পারে। প্রতিটি ডিগ্রীর সদস্যদের জন্য পৃথক পৃথক উপাধি ও ব্যাজ রয়েছে। রেড ক্রস নাইট (Red Cross Night), নাইট অব্ মালটা (Night of Malta), সিক্রেট মাষ্টার (Secret Master), নাইট অব দি ইষ্ট (Knight of the East) ইত্যাদি হচ্ছে ফ্রিম্যাসন সদস্যদের বিভিন্ন ডিগ্রীর উপাধি। এদের ব্যাজগুলো এরা কখনও লজের বাইরে ব্যবহার করে না। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক শব্দ দ্বারা এরা পারস্পরিক মনোভাব প্রকাশ করে। সাধারণ পার্টি ও অনুষ্ঠানাদিতে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে। এদের পোশাকে বিশেষ ধরনের চিহ্ন বা দাঁড়ানোর বিশেষ ভঙ্গিমা থেকেই ফ্রিম্যাসনের একজন সদস্য অপরজনকে চিনতে পারে। একজনের বাড়ীতে অপরজন দেখা করতে গেলে দরযায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনেই বাড়ীর মালিক বুঝতে পারে যে, তারই মত একজন ফ্রিম্যাসনের সদস্য দরযার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সদস্যগণ পরস্পর পরস্পরকে "ভাই" (Brother) সম্বোধন করে থাকে।

প্রটোকোল গ্রন্থের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ অধ্যায়ে ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আর লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রটোকোল প্রণয়নকারীদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে পুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে "৩৩তম ডিগ্রির জাইওন প্রতিনিধির দ্বারা স্বাক্ষরিত।" ফ্রিম্যাসন আন্দোলনেরই ৩৩টি ডিগ্রি আছে তারাই যে তা স্বাক্ষর করেছে তা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। ৩৩তম ডিগ্রির ম্যাসন সদস্যগণ হচ্ছে এ আন্দোলনের উচ্চতম শ্রেণী। তাদের উপাধি ইন্সপেক্টর জেনারেল (Inspector general)। দুনিয়ার অতি অল্প সংখ্যক সদস্যই এ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। ফ্রিম্যাসনদের সুপ্রীম কাউন্সিল এ উপাধি দান করে থাকে।

এদের প্রধান দফরত লণ্ডনে। বিভিন্ন দেশে লজ স্থাপন করে অতি সংগোপনে এরা কি ধরনের আন্দোলন করে তা কারো জানা নেই। অথচ প্রায় সকল দেশেই এদের তৎপরতা চলছে। সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ, উচ্চপদস্থ সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীবৃন্দকে এরা এ দলের সদস্য করে নেয়ার জন্য চেষ্টা করে। একটি লজে হয়ত বা একজন বা দু'জন ইহুদী সদস্য থাকতে পারে। দৃশ্যত কোন ইহুদী নাও থাকতে পারে। কিন্তু এতে কিছুই আসে যায় না। লজের কার্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা হয় যেন এর তৎপরতা

ইহুদী স্বার্থের অনুকূলে যায়। অনেক সদস্য বুঝতেই পারে না যে, তারা ইহুদী স্বার্থের পক্ষে কাজ করছে।

বিগত ১৬ই মে ১৯৬৮ তারিখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরকালে অর্থ উজীর জনাব উকায়লী জানান যে, ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সরকার ফ্রিম্যাসন লজগুলোকে ৪৩ হাজার ৯ শত ১৩ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেছেন, (দৈনিক আজাদ ১৮-০৫-৬৮)। জনাব উকায়লী আরও জানান, দাতব্য কাজের জন্যই নাকি এ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে দাতব্য কাজ করার জন্য গুপ্ত আন্দোলনের প্রয়োজন কি ? আর লণ্ডন থেকে এদের লজ কায়েম করার জন্য মঞ্জুরী আনয়নেরই বা প্রয়োজন কি ?

বিগত ৩০শে মে ১৯৬৮ তারিখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মখদুম জাদা সৈয়দ হামিদ রাজা গিলানী জানান যে, পাকিস্তান সরকার ফ্রিম্যাসন আন্দোলন বেআইনি ঘোষণা করবেন না। সরকারের দৃষ্টিতে এটা নাকি একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের মারফতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থ বিতরণ করছে এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জবাবে জনাব গিলানী জানান যে, "সরকার এ সম্পর্কে কোন কিছুই অবগত নয়।"

এদিকে লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'এশিয়া'র ২রা জুন সংখ্যা এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও-এর ৯ই জনু সংখ্যায় যে খবর ছাপা হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তান সরকার ১৯৬৬ সাল থেকে সামরিক অফিসারগণকে ফ্রিম্যাসন, লায়নস্ ক্লাব এবং রোটারী ইনটারন্যাশনালের সদস্য হতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। জাতীয় পরিষদের চলতি অধিবেশনে জানানো হয়েছে যে, বিদেশী প্রভাব অনুপ্রবেশের আশংকায়ই সরকার এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যদি তাই সত্য হয় তাহলে এ আন্দোলনকে এখানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে অসুবিধা কি ?

আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় পাকিস্তান থেকেও ইসরাঈলদের সাহায্যার্থে চাঁদা তোলা হয়েছে এবং তা যথাস্থানে প্রেরিত হয়েছে বলেও 'এশিয়া' পত্রিকার উল্লিখিত খবর থেকে জানা যায়। প্রশ্ন হলো, এ চাঁদা কি করে সংগৃহীত হলো এবং কি উপায়ে তা প্রেরিত হলো ? তবে কি সরকারী অফিসের উপর তলায় ইহুদী বা ইহুদী ভক্ত রয়েছে ? ফ্রিম্যাসন আন্দোলনে উচ্চপদস্থ বেসামরিক অফিসার জড়িত থাকা অসম্ভব নয়। কেননা, পাকিস্তান সরকার শুধু মাত্র সামরিক অফিসারদেরই এর সদস্য পদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে হজ্জ যাত্রীদের পর্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অথচ কোন্ সেবামূলক কাজের জন্য ফ্রিম্যাসনদের বৈদেশিক মুদ্রা দিতে হয়েছিল?

জনাব মখদুম জাদা গিলানী আরও বলেছেন যে, ফ্রিম্যাসন আন্দোলন ইহুদী পরিচালিত নয়। অথচ ইসরাঈল রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায় ছয় কোণ বিশিষ্ট যে তারকা চিহ্ন রয়েছে সে চিহ্নটিই ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের প্রতীক চিহ্ন। ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিটি গাড়ী, জাহাজ ও বিমানে এ তারকা চিহ্ন রয়েছে।

তুর্কীর বিপ্লবে ফ্রিম্যাসনদের কি পরিমাণ প্রভাব ছিল তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সুখের বিষয় তুর্কী সরকার ফ্রিম্যাসনদের বেআইনী ঘোষণা করার ফায়সালা করেছেন। পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রেও অবিলম্বে ফ্রিম্যাসনও এ ধরনের গুপ্ত তৎপরতায় লিপ্ত সকল আন্দোলন বন্ধ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

লায়ন ও রোটারী ক্লাব ঃ লায়ন ও রোটারী ক্লাব নামেও দু'টি ক্লাব পাকিস্তানের ছোট বড় শহরগুলোতে কাজ করছে। এসব ক্লাবের নামই বিদেশী ভাবধারার বাহক। এছাড়া এ ক্লাবগুলোর আদর্শ, উদ্দেশ্য, কার্যসূচী ও সংগঠন পদ্ধতি অত্যন্ত গোপন। সাধারণত সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরাই এসব ক্লাবে যোগদান করে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদেরও এ উভয় ক্লাবের সদস্য পদ গ্রহণ করতে দেখা যায়। পাকিস্তান সরকার সামরিক অফিসারদের এসব ক্লাবে যোগদান করতে নিষেধ করার ফলে এতটুকু তো পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, দেশ রক্ষার দৃষ্টিতে এসব ক্লাব কর্তৃপক্ষের চোখেও সন্দেহজনক ঠেকছে।

২রা জুন তারিখের সাপ্তাহিক 'এশিয়া' (লাহোর) পত্রিকায় "Jewish Conspiracy and the Muslim world" বইয়ের লেখক জনাব মিছবাহুল ইসলাম ফারুকী একটি প্রবন্ধ লিখে সরকারের নিকট ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে লায়ন এবং রোটারী ক্লাব দু'টিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবী জানিয়েছেন।

সাবাই আন্দোলন

লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু ডাইজেষ্ট পত্রিকার, আগষ্ট ৬৭ সংখ্যায় "বিভিন্ন আন্দোলনের বেশে ইহুদী" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ঐ প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় যে হাংগামা সৃষ্টি হয়েছিল তাও ছিল ইহুদী চক্রান্তেরই একটি অংশ। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাই নামে যে ব্যক্তিটি এ হাংগামা শুরু করেছিল সে ইয়ামেনের অন্তর্গত

'ছানা' শহরের অধিবাসী জনৈক ইহুদী। এ ব্যক্তি ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে বিভেধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়েছিল। অত্যন্ত চালাক, দূরদর্শী ও ধূর্ত ছিল সে।

তাই আরব দেশের প্রাচীন গোত্রীয় বিদ্বেষকে সে পুনরায় জাগিয়ে তোলে এবং বনী উমাইয়া ও বনী হাশেমের মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জালিয়ে দেয়। ইসলামের পরশে কিছুকাল আগেই এ আগুন নিভে গিয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে সাবাই-এর চক্রান্তে গোত্রীয় বিদ্বেষ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আর এভাবে মুসলমানদের হাতেই মুসলমানের অপরিমিত রক্তক্ষয় হয়। "হযরত মুহাম্মদ (সা) দুনিয়াতে আবার ফিরে আসবেন এবং প্রত্যেক নবীরই একজন করে ব্যক্তিগত অছি" থাকার মতবাদও তারই মগজ প্রসূত। এটাকেই 'সাবাই' মতবাদ বলা হয়।

মোতাযিলা

আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মুতাযিলা মতবাদের জন্ম হয়। সুন্নাহকে দ্বীনের কাঠামো থেকে বাদ দিয়ে কুরআনের নির্দেশবাণীকে যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই করে গ্রহণ করার এ মতবাদটিও ইহুদীদেরই রচিত। এন্‌সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার প্রবন্ধকার Sicil Rath (সিসিল রাথ) 'Jew' (ইহুদী) শব্দের টীকা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"মধ্য যুগে দুনিয়ায় অতি অল্প সংখ্যক ইহুদী ছিল। তাই এদের পক্ষে বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র ও দর্শন ছাড়া পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতিতে অন্য কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব ছিল না। তবু এরা নিজেদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী কাজ করেছে ......। আরব জাহানে এরাই ইউনানী চিন্তাধারার প্রসার ও মুতাযিলা মতবাদের সূচনা করে।"

দুন্‌মা সম্প্রদায়

১৬৬৬ ঈসায়ী সালে শারতে শিবী নামক জনৈক স্মার্ণাবাসী ইহুদী নিজেকে মসিহ মউদ বলে দাবী করে এবং বিপুল সংখ্যক ইহুদী তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। শিবী সিরিয়া ও বায়তুল মুকাদ্দাস সফর করে ইস্তাম্বুল পৌছার পর তুর্কীর তৎকালীন শাসনকর্তা সুলতান মুহাম্মদ খান (৪র্থ) এ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন। শিবী তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং তার ভক্তের দলও তাঁর অনুসরণ করে মুসলমানদের জামায়াতে শামিল হয়ে যায়। এদেরকে দুন্‌মা মুসলমান বলা হতো। দুন্‌মা অর্থ প্রত্যাবর্তনকারী। বাহ্যত এরা মুসলিম জামায়াতে শামিল হলেও প্রকৃতপক্ষে এদের মন-মগজ ইহুদী মতবাদেরই বাহক ছিল। এরা তাই তুর্কীর উসমানিয়া খেলাফত ধ্বংস করার তৎপরতায়

লিপ্ত হয় এবং "ঐক্য ও প্রগতি সংস্থা" (Committee of Union & Progress) গঠন করে বহু সরল প্রাণ তুর্কী যুবকদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। মিঃ আর ডব্লিউ সিটন ওয়াটশন (R.W. Seton Watson) তদীয় Rise of Nationality in the Balkans পুস্তকে লিখেছেন যে, ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত 'দুন্‌মা' দলীয় লোকই "ঐক্য ও প্রগতি সংস্থার" পুরোভাগে ছিল। The Emergence of Modern Turky গ্রন্থের প্রণেতা বার্ণার্ড লিউইস (Barnard Lewish) তুর্কীর "ফ্রিম্যাসন" ও ঐক্য প্রগতি সংস্থার নির্দোষিতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের মধ্যে ক্যাবিট (Cabid) নামক যে যুবকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তাকে একজন দুন্‌মা বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসিক উর্দু ডাইজেষ্ট (লাহোর) আগষ্ট, ১৯৬৭ সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জনৈক ফরাসী লেখকের উদ্ধৃতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, তুর্কীতে মুসলিম রূপী 'দুন্‌মা দল সে সময় অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। দানিয়ুব প্রদেশের তৎকালীন গভর্নর মাদহাত পাশা 'দুন্‌মা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তার পিতা ছিল হাঙ্গেরীর অধিবাসী হাথাম নামীয় জনৈক ইহুদী। ঐ একই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, ঐক্য ও প্রগতি সংস্থার নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই 'দুন্‌মা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ডঃ নাজেম, ফওজী পাশা, তালাত পাশা, ছগুম আফেন্দী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সকলেই দুন্‌মা সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ঐক্য ও প্রগতি সংস্থার নেতৃত্বদান ও ম্যাসনারীদের যোগাযোগে খিলাফতের উচ্ছেদ সাধনে এদের সব কয়েকজনকেই প্রথম সারিতে দেখা যায়।

সমাজতন্ত্র

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা কার্লমার্কস থেকে শুরু করে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়ার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব যারা প্রথম গ্রহণ করেছিল তাদের প্রায় সকলেই ছিল ইহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত। উর্দু ডাইজেষ্ট পত্রিকার আগষ্ট, ১৯৬৭ সালের সংখ্যায় জনাব খুরশিদুজ্জামানের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, বিপ্লব পূর্ব যুগে রাশিয়ায় সোসালিষ্ট ডেমোক্রেটিক পার্টি নামক যে দলটি আন্দোলন শুরু করেছিল তার শতকরা ৫০জন সদস্য ছিল ইহুদী। লিথুনিয়ার সোসালিষ্ট ডেমোক্রেটিক পার্টিও অনুরূপভাবে ইহুদীদের দ্বারাই গঠিত এবং পরিচালিত হয়েছিল। ঐ একই প্রবন্ধে ইহুদী ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নের তথ্যগুলোও পাওয়া যায় ঃ

(১) বলশেভিক আন্দোলন ইহুদীদেরই অর্থ-সম্পদে পরিচালিত হচ্ছিল এবং জ্যাকব শিফ, কুহন লুইবা, ব্যাংকিং হাউজ, ওয়েষ্ট ফলেন রাইন ল্যাণ্ড

সিন্ডিকেট, ইয়ার্জীন ব্যাংকিং হাউজ প্রমুখ ব্যাংক মালিকগণই অর্থ সাহায্য দিয়ে বলশেভিকদের* আন্দোলন মজবুত করে গড়ে তুলেছিল।

(২) ১৯১৯ সালে আর্জেন্টিনায় কমুনিষ্ট দল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহের নেতা জেদ্রোওয়ালও এবং যুদ্ধ মন্ত্রী মেকারুজিয়াতিন উভয়ই ইহুদী ছিল।

(৩) ১৯৩১ সালে চিলিতে এবং ১৯৩২ সালে উরুগুয়েতে কমুনিষ্টগণ যে হাংগামা সৃষ্টি করেছিল, এর মূলেও ইহুদীদেরই নেতৃত্ব ছিল।

(৪) ব্রাজিলে অল্প কয়দিনের জন্য কমুনিষ্ট দল বিপ্লব ঘটিয়েছিল এবং এ বিপ্লবের নেতা মন্টুভিড্‌কে জনৈক ইহুদী চামড়া ব্যবসায়ীর মারফত রুশীয় দূতাবাস থেকেই অর্থ সাহায্য দেয়া হয়েছিল।

(৫) মেক্সিকোতে বিন্টারকো আল মারুফ কেলিজ বলশেভিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এ ব্যক্তি একজন সিরিয়াবাসী ইহুদীর পুত্র এবং ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের ৩৩তম ডিগ্রির সদস্য ছিল। তার সহচর এরিন ছায়েরও ইহুদী ছিল।

(৬) আমেরিকায় যেসব কমুনিষ্ট রয়েছে তাদের বেশীর ভাগই ইহুদী। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের কমুনিষ্ট আন্দোলন ইহুদীদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হচ্ছে।

মোদ্দাকথা চক্রান্তশীল ইহুদী জাতি বিভিন্ন আন্দোলনের ছদ্মাবরণে সাধারণ মানুষকে তাদের ফাঁদে আটক করে। প্রটোকোল বই থেকেও জানা যায় যে, পরস্পর বিরোধী মতবাদগুলোর প্রত্যেকটির নেতৃত্বেই ইহুদীদের হাত থাকে। নানাবিধ ফাঁকা বুলিতে মানুষকে মুগ্ধ করে রেখে ইহুদীদের স্বার্থোদ্ধারই এদের লক্ষ্য।

পাকিস্তানে ইহুদী

পৃথিবীর কোন্ দেশে কত সংখ্যক ইহুদী রয়েছে, তা আমরা ইতিপূর্বে এ বইয়েরই এক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। ঐ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পাকিস্তানে ৭০০ ইহুদীর বাস। এরা কোথায় কি কাজে রয়েছে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে এতটুকু জানতে পেরেছি যে, ইহুদী সম্প্রদায় যেখানেই থাকুক—ব্যবসায় ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক সভা সমিতির ছদ্মাবরণে দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এরা বিচরণ করে এবং সুযোগ সুবিধা মত ইহুদী স্বার্থের অনুকূলে কাজ হাসিল করিয়ে নেয়। বড় বড় হোটেল, চলচিত্র প্রযোজনা, প্রেক্ষাগৃহ, ব্যাংক, ফ্রিম্যাসন

* Boishevik Party : বলশেভিক দল বিপ্লবপূর্ব যুগে রাশিয়ান কমুনিষ্ট দল মেনশেভিক ও বলশেভিক নামীয় দু'টি দলে বিভক্ত ছিল।

লজ, প্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আবরণে গা ঢাকা দিয়ে ইহুদীগণ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকে। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পাকিস্তানের ছোট ও বড় শহরগুলোতে ফ্রিম্যাসন লজ, রোটারী ও লায়ন ক্লাবগুলো গুপ্ত তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় ইসরাঈলদের স্বপক্ষে পাকিস্তান থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে ইসরাঈলে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও এ বইয়ের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্প্রতি আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। করাচীর উর্দু দৈনিক 'জং' পত্রিকায় ১৩ই জুন ৬৮ ঈসায়ী সংখ্যায় প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায় যে, ইসরাঈলের যুদ্ধ মন্ত্রী মোসে দাইয়ানের কন্যা লেফটেন্যান্ট ইয়াইল দাইয়ানের লেখা A Soldier's Dairy (একজন সৈনিকের ডাইরী) নামক পুস্তকখানা লণ্ডন থেকে আনয়ন করে করাচীতে ছাপানো হয় এবং ১০ টাকা মূল্যের এ পুস্তকখানা দেশের উভয় অংশে বিক্রি হতে থাকে। অথচ উক্ত পুস্তকে আরব মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক ও অপমানকর উক্তি এবং ইহুদীদের স্বপক্ষে জোরদার প্রচারণা থাকার দরুন পাকিস্তান সরকার কিছুদিন পূর্বেই পুস্তকখানাকে পাকিস্তানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এ নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পুস্তকখানা ইংলণ্ড থেকে আনয়ন করে কি করে কিভাবে ছাপানো হলো এবং কি উপায়েই বা এ বই দেশের উভয় অংশে বিক্রি হলো তা রীতিমত কৌতুহলজনক। এ কাজটি নিশ্চয়ই ইহুদীদের স্বার্থে এবং তাদেরই প্ররোচনায় করা হয়েছে। কিন্তু করাচী পুলিশ এ ব্যাপারে যাদের গ্রেফতার করেছেন তারা ইহুদী নয়— পাকিস্তানী মুসলমান। তাই বুঝা যাচ্ছে, পাকিস্তানেও মুসলমানদের দ্বারা কাজ হাসিল করিয়ে নেবার মত ফন্দী-ফিকির এদের রয়েছে। আর ইহুদী চরিত্রের সঙ্গে এটা খুবই সামঞ্জস্যশীল।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দুশমনী একটি জ্বলজ্যান্ত বাস্তব। আযাদী অর্জনের পর থেকে ভারত পাকিস্তানকে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। আর কোনদিন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে, এ আশাও করা যায় না। কেননা ভারতের নেতৃস্থানীয় হিন্দু নেতাগণ পাকিস্তানকে আজও অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতের উজীরে আযম মিসেস ইন্দিরা গান্ধী অতি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, কাশ্মীর সমস্যার দরুন পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্ততর হচ্ছে, একথা সত্য নয়। বরং মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিতে "সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে" পাকিস্তানের জন্মই বিরোধের মূল কারণ। আযাদীর পর থেকেই ভারতের হিন্দু নেতাগণ পাকিস্তানকে পুনরায় ভারতের মধ্যে শামিল করে নেয়ার স্বপ্ন দেখছে এবং এ জন্যই এরা নানাবিধ জঘন্য পন্থা অবলম্বন করে এ দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করার প্রয়াস পাচ্ছে।

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিনা নোটিশে রাতের আঁধারে ভারতের বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে পাকিস্তান আক্রমণ থেকেই একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। এহেন ভারতের সঙ্গে ইসরাঈলের মিতালী চলছে। নৈতিকতা, দেশ প্রেম, বীরত্ব ও সামরিক নিপুণতায় ভারত পাকিস্তানের ইসলামী শক্তির হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। আর তাদের এ ক্ষতিপূরণের জন্য এগিয়ে এলো ইসরাঈল। ইসরাঈল ভারতকে আর্থিক সাহায্য তো দিচ্ছেই তদুপরি বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করেও পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর দুর্ধর্ষ প্রতি আক্রমণে ধরাশায়ী ভারতকে খাড়া করার চেষ্টা করছে।

ভারতের এ আক্রমণকে নিছক একটি মাত্র দেশের বিশ্বাসঘাতকতা মনে করা যায় না। বরং নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব, তাসখন্দের পূর্বে ও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকা থেকে দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য কয়েকটি প্রভাবশীল দেশই আক্রমণের জন্য ভারতকে লেলিয়ে দিয়েছিল। আর ওদেশগুলোতে ইহুদীদের প্রভাব সর্বজন বিদিত।

ভারতের চরম মুসলিম বিদ্বেষী জনসংঘ দলের প্রধান ইসরাঈল সফর করে এসেছেন এবং সেখান থেকে তার ফিরে আসার পর গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে। ভারতের ইসরাঈলী দূতাবাস থেকে গো-হত্যা নিবারণের নামে মুসলিম হত্যার অভিযানকে উৎসাহীত করা হচ্ছে বলেও সংবাদ পত্র থেকে জানা যায়।-(আখবারে জাহান, করাচী, ১২-২-৬৭)

এমতাবস্থায় পাকিস্তানের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পাকিস্তানে যেসব ইহুদী রয়েছে তাদের প্রতি কড়া নজর রাখা এবং এদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে ভবিষ্যতে যে অঘটন ঘটতে পারে এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

মুসলিম জাহানের কর্তব্য

ইহুদীবাদের উদ্দেশ্য, কার্যসূচী ও চক্রান্ত সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য জানতে পারলাম তা যে মুসলিম জাহানের জন্য এক ভয়াবহ পরিণামের চিত্র পেশ করছে ; এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন তন্ত্র বা ইজমের (যথা সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ইত্যাদি) পূজারীগণ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় একমত। আরব মুসলিম জাহানের বুকে ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, কাশ্মীরে ভারতের জবর দখল ও মুসলমানের রক্তে হোলিখেলা, সাইপ্রাসে খৃষ্টানদের মুসলিম নিধন অভিযান ইত্যাদি বিষয়ে মানবতা ও বিশ্বশান্তির ধ্বজাধারী বড় বড় জাতিগুলোর ভূমিকা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের তারা কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্মম হত্যাকাণ্ডে যারা কেঁদেকেটে অস্থির তারা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরব-মুসলিমদের প্রতি ইসরাঈলের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করে না। অনুরূপভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত কাশ্মীরে, আর ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলাসেলাসী ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়ার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের যে ষ্টীমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে ; মানবতার একচেটিয়া ঠিকাদারদের মনে এজন্যও কোন ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। কারণ, এসব দেশের মযলুম জনতা হচ্ছে মুসলমান। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের "আলখেল্লা" পরে থাকা সত্ত্বেও তারা ঘোর সাম্প্রদায়িক। তথাকথিত—আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম জাহানের নেতৃবৃন্দ ইসলামের দুশমনদের দেখাদেখি নিজেরাও ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং বেশভূষা, চাল-চলন ও সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদেরই অনুসরণ করে চলেছে। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অমুসলিমেরা ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করে মাত্র—ভেতরে ভেতরে এরা ঘোর সাম্প্রদায়িক। মুসলমান নেতারা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত—অর্থাৎ তারা ইসলাম মেনে চলার ভান করেন এবং কার্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ইসলাম নিরপেক্ষ জীবনযাপন করেন।

অতীত ঘটনাবলী থেকে এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমান নেতাগণ বিজাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যতই অনুকরণ করুন না কেন—যাদের অনুকরণ করা হয় তারা কিন্তু নকল নবীশদের কোন মর্যাদাই দান করে না। কাশ্মীর সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ আমাদের সুট-কোট পরা নকল সাহেবদের চেয়ে ধুতী পরা হিন্দুদেরই বেশী মর্যাদা দান

করেছে। তাসখন্দ ঘোষণা আমাদের এ উক্তির জলন্ত প্রমাণ। এরপরও যদি মুসলমানদের চৈতন্যোদয় না হয় তাহলে আমাদের ভাগ্যে আরও দুর্ভোগ বাকী রয়েছে বলেই মনে করতে হবে। মুসলিম জাহানের চিন্তাশীল মহল ও নেতৃবৃন্দকে আর সময় অপচয় না করে প্রতিকারের উপায়-পন্থা অনুসন্ধান করা দরকার।

আমাদের বিশ্বাস, মুসলিম জাহানের এ দুর্গতির প্রধান কারণ হচ্ছে আদর্শ বিচ্যুতি, ব্যক্তিগতভাবে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ইসলামী জীবনাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী হলেও মুসলিম জাহানের কোন দেশেই ইসলামী আদর্শকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত করা হয়নি। বরং সমষ্টিগত জীবনে মুসলমান দেশগুলো অনৈসলামিক আদর্শই অনুকরণ করে চলছে। ফলে সমষ্টিগত ক্ষেত্রে তাদের চিন্তার ঐক্যসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী হবার দরুন পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। জাতি হিসেবে মুসলমান দুনিয়ায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। এ দুরবস্থা থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে অনৈসলামিক মতবাদ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ থেকে নিজেদের উদ্ধার করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ।

এতদুদ্দেশ্যে মুসলিম দেশগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলে জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যস্থিত বিরোধ মিটে যাবে এবং সকল দেশেই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

সমগ্র মুসলিম জাহানের শিক্ষাব্যবস্থাই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রণয়ন করতে হবে। এ কাজ করায় সুফল হবে এই যে, মুসলিম জাহানের সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই মন-মেজাজ ও চরিত্র একই ধরনের গড়ে উঠবে এবং ইসলামী আদর্শের প্রতি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করার মনোবল সম্পন্ন শিক্ষিত শ্রেণী পরাণুকরণের রোগ থেকে মুক্তিলাভ করবে।

মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য সকল মুসলিম দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এমন একটি সংস্থা কায়েম করতে হবে যেন যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ ওখানেই মিটে যেতে পারে। সকল মুসলিম দেশই একটি ওয়াদাপত্রে স্বাক্ষর করে উল্লেখিত সংস্থার ফায়সালা মেনে নেয়ার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে এবং অমান্যকারীর বিরুদ্ধে অপর সকলে মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থাও উক্ত চুক্তিতে শামিল থাকবে।

মুসলিম জাহানের একটি নিজস্ব উন্নয়ন তহবিল থাকা অত্যন্ত জরুরী। সকল মুসলিম দেশই নিজ নিজ সাধ্যানুসারে উক্ত তহবিলে সাহায্য দান করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে উক্ত তহবিল মুসলিম জাহানের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করবে।

মুসলিম জাহানের নিজস্ব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থাকা অত্যন্ত জরুরী। কেননা বর্তমানে যেসব প্রতিষ্ঠান খবর আদান-প্রদানের কাজে লিপ্ত আছে সেগুলো মুসলিম বিদ্বেষীদেরই মালিকানা অথবা প্রভাবে রয়েছে। এদের অনেকগুলো তো সরাসরি ইহুদীদেরই নিয়ন্ত্রিত।

অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপারে অন্যান্য জাতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা মুসলিম জাহানের পক্ষে কিছুতেই সঙ্গত নয় বরং সকল মুসলিম দেশের একটি অস্ত্রনির্মাণ কারখানা কায়েম করার জন্য মিলিতভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত।

মুসলিম জাহানের সমর বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি প্রতিরক্ষা সংস্থা কায়েম অত্যন্ত জরুরী। এ সংস্থাটি সমগ্র মুসলিম জাহানের সামরিক নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সর্বদা তৎপর থাকবে। ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী জাতিগুলোর সামরিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা এবং যথাসময়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রতিরক্ষা সংস্থাকেই দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনগণের মন-মগজ থেকে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ছাপ মুছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রচার ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম ভিত্তিক ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দুনিয়ার প্রতিটি মুসলমান ভাষা, গায়ের রং ও ভৌগলিক অবস্থান পার্থক্য ভুলে গিয়ে যেদিন নিজেদের একই উম্মত বলে বিবেচনা করতে শুরু করবে সেদিন মুসলমানদের শক্তি হবে অপরাজেয়।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সহযোগিতায় দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। আধুনিক জগতের প্রচলিত অনৈসলামিক মতবাদগুলোর বলিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমে এগুলোর দুর্বলতা ধরিয়ে দেয়া এবং ইসলামী আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি প্রণয়ন ও প্রকাশ করে বিভ্রান্ত মানব সমাজকে বিশ্বশান্তির পথ দেখাতে হবে। এর ফলে অমুসলমানদের মধ্য থেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মুসলিম মিল্লাতের দিকে টেনে আনা যাবে এবং মুসলিম যুবকদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে।

আমরা আন্তরিকতা সহকারে আশা করি—মুসলিম জাহানের চিন্তাশীল ও নেতৃস্থানীয় মহল আর কালক্ষেপণ না করে অনতিবিলম্বে নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করার জন্য অগ্রসর হবেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি বলিষ্ঠ কার্যসূচী প্রণয়ন করে দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক মুসলিমদের খোদা নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে আসমানী সাহায্য প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিজ্ঞ ইহুদী মুরুব্বিদের রচিত প্রটোকোলে

কায়দা-কানুন

তরজমা

৩৩তম ডিগ্রীর ইহুদী প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা সংরক্ষিত

প্রটোকোল

পরিচয়

প্রটোকোল একখানা মূল্যবান দলিল। দুনিয়ার মানুষকে সর্বপ্রথম এ বই সম্পর্কে অবগত করিয়েছেন প্রফেসর সারকিল এ নাইলাস নামক জনৈক গোঁড়া রুশীয় পাদ্রী। ১৯০৫ সালে প্রফেসর নাইলাস বইখানা প্রকাশ করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "ইহুদী ফ্রিম্যাসন ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল" ফ্রান্সের একটি ফ্রিম্যাসন লজ থেকে জনৈকা মহিলা মূল বইখানা (সম্ভবত হিব্রু ভাষায় লিখিত) চুরি করে এনেছিলেন এবং তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে এ ঘটনার পর কোন মহিলাকেই ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের সদস্য করা হয় না এবং সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মহিলাদের ফ্রিম্যাসন লজে যাবার অনুমতি দিলেও বৈঠকাদির সময় এদের বের করে দেয়া হয়।

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রফেসর নাইলাস এ বইয়ের একটা নয়া সংস্করণ তৈরী করেন এবং বইখানা বাজারে বের হবার আগেই ঐ বছর মার্চ মাসে রাশিয়ায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। জার (CZAR) সরকারকে উচ্ছেদ করে ক্ষমতা দখলকারী কীরিনিস্কী সরকার প্রটোকোলের সকল কপি বিনষ্ট করে দেয়। কারণ এ বইয়ের মাধ্যমে রুশ বিপ্লবের গুপ্ত তথ্য ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। নাইলাসকে গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপ করা হয় এবং অমানুষিক দৈহিক নির্যাতনের পর রাশিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। নাইলাস ১৯২৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ব্লাডিমিরে (VLADIMR) মারা যান।

বইখানার চাহিদা এতবেশী হয়েছিল যে, ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এর ৪টি সংস্করণ প্রকাশ হয়। ছাপানো পুস্তক ছাড়া পাতলা কাগজে টাইপ করেও এ পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছিল। ধান পাতার তৈরী এক প্রকার কাগজে লেখা প্রটোকোল পুস্তক সাইবেরিয়া অঞ্চলে প্রচার হয়েছিল। এরই এক কপি ১৯৩৯ সালে আমেরিকায় পৌছে যায় এবং সেখানে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রটোকোলের ইংরেজী অনুবাদকারী ছিলেন ভিক্টর ই মারসডেন (Victor E Marsden)। ইনি একজন ইংরেজ। দীর্ঘকাল রাশিয়ায় বসবাস করে এক রুশ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মর্নিং পোষ্ট পত্রিকার রুশীয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৩৭ সালের বিপ্লব তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং এর লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন। এ জন্য তাঁকে গ্রেফতার করে দু' বছর "পিটার পল" জেলে রাখা হয় এবং সেখান থেকে মুক্তির পর ইংলণ্ডে ফিরে এসে তিনি বৃটিশ মিউজিয়ামে বসে এর

তরজমা করেন। বলশেভিক (Bolshevic) বিপ্লবের পর রাশিয়া থেকে যেসব আশ্রয় প্রার্থী আমেরিকা ও জার্মানীতে আশ্রয় নেয় তারাও প্রফেসর নাইলাস অনূদিত প্রটোকোলের কিছু কপি সংগে নিয়ে আসে।

নাইলাস খৃষ্টান ছিলেন এবং তাঁর নিজের ধর্মকে ইহুদী ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ বইখানা বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

প্রটোকোল বইখানা গুপ্ত প্রতিষ্ঠান মারফত বিশ্বসমাজ কায়েম করার ইহুদী পরিকল্পিত একটি নকসা। এ নকসায় যে ধরনের বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়েছে তাকে পুলিশি রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে যে, পৃথিবীতে যে কয়টি বড় ধরনের ঘটনা বা দুর্ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে তাঁর সবগুলোই প্রটোকোল বইয়ে পূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণীর মত লিখে রাখা হয়েছে। আমরা ইংরেজী থেকে তাই তার বাংলা অনুবাদ করছি। পাঠক মাত্রই মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে বিশ্বব্যাপী ইহুদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন। তবে অন্যান্য বইয়ের মত এটাকে দ্রুত গতিতে পড়ে গেলে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। বেশ ধীরে ধীরে এবং প্রতিটি বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করে অগ্রসর হলে অনেক তথ্য জানা যাবে।

প্রটোকোলে ব্যবহৃত পরিভাষা

AGENTUR ঃ দালাল গোষ্ঠী ঃ মূল বইতে "এজেন্টুর" লেখা হয়েছে। ইহুদী পণ্ডিতগণ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে এদের যেসব চর ও অন-ইহুদী দালাল নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে সেগুলোকে একত্রে অর্থাৎ চর ও দালাল নিয়োগের এ ব্যবস্থাধীন কার্যরত জনসমষ্টিকে এজেন্টুর বলা হয়েছে। বাংলায় আমরা এর তরজমা করেছি "দালাল গোষ্ঠী"।

The Political ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঃ এর অর্থ—গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

Goyim ঃ গইম ঃ এর অর্থ অন-ইহুদী। এ শব্দটি প্রটোকোল বইতে বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলায় আমরা এটাকে এভাবেই ব্যবহার করেছি।

Goy ঃ গয় ঃ হিব্রু অক্ষরে লিখিত জার্মান ভাষার এ শব্দটি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদীগণ ব্যবহার করে। এর অর্থও অন-ইহুদী।

Gentile ঃ ইহুদী বংশে যাদের জন্ম হয়নি।

The Symbolic Snake ঃ প্রতীকধারী সাপ ঃ তৃতীয় সংস্করণ প্রটোকোলে একটি প্রতীক সাপের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রফেসর নাইলাস তার

১৯০৫ সালের প্রটোকোল সংস্করণের ভূমিকায় প্রতীক সাপ সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পেশ করেছেন। আমরা তার বর্ণনার তরজমা পেশ করছি ঃ

"গুপ্ত ইহুদীবাদ আন্দোলনের কাগজ-পত্র থেকে জানা যায় যে, ইহুদী পণ্ডিতেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র বিশ্বজয়ের এক পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন।"

"ইতিহাসের বিবর্তনের সাথে সাথে এ মূল পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করার বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যায়। ইহুদী পণ্ডিতেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র বিশ্বকে ইহুদীবাদের পদানত করার জন্য সাপের মত ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে সাপকেই প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে।

এ সাপের মস্তক ইহুদীবাদের পরিকল্পনা রচনাকারীদের এবং এর দেহ সমগ্র ইহুদী জন সমষ্টির প্রতীক। ইহুদীবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগঠন কায়েম করা হয় তার সংগঠন ও নেতৃত্ব গোপন রাখা হয়। এমনকি ইহুদী জনসাধারণও এ সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়।"

"হুবহু পরিকল্পনা মাফিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য এ সাপের মাথা জাইওন পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছবে এবং এর আগে সে ইউরোপের চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরে এ মহাদেশটিকে শক্তভাবে ঘেরাও করে ফেলবে এবং এরপর ধীরে ধীরে সারা দুনিয়া তার আবেষ্টনীর আওতায় চলে যাবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক প্রাধান্য কায়েম করে, এর মাধ্যমেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।"

"সাপের মাথাটিকে জাইওন পাহাড়ে ফিরে যেতে হলে ইউরোপের সকল সার্বভৌম শক্তিগুলোকে খর্ব করতে হবে। অর্থনৈতিক দূরাবস্থা সৃষ্টি ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক অধপতন ঘটিয়েই এসব সার্বভৌম রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে হবে। আর নৈতিক অধপতন ঘটানোর জন্য ফরাসী অথবা ইটালীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ ধারণ করে ইহুদী রমণীগণ সহায়তা করবে। জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার সুনিশ্চিত হাতিয়ারই হচ্ছে যুবতী নারীর দল।"

"সাপটি যেসব দেশ অতিক্রম করেছে সেসব দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়েছে। বাহ্য দৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হলেও জার্মান দেশ প্রকৃতপক্ষে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন। জার্মান ও ইংল্যাণ্ডকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও সুযোগ দেয়া হচ্ছে। রাশিয়ায় এ সাপের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এ দু'টি দেশ অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কারণ, সাপের (১৯০৫ সালে) তৎপরতা রাশিয়াতেই কেন্দ্রীভূত। নকসাতে সাপের

১৯০৫ সালের প্রটোকোল সংস্করণের ভূমিকায় প্রতীক সাপ সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পেশ করেছেন। আমরা তার বর্ণনার তরজমা পেশ করছি ঃ

"গুপ্ত ইহুদীবাদ আন্দোলনের কাগজ-পত্র থেকে জানা যায় যে, ইহুদী পণ্ডিতেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র বিশ্বজয়ের এক পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন।"

"ইতিহাসের বিবর্তনের সাথে সাথে এ মূল পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করার বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় এবং এর বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যায়। ইহুদী পণ্ডিতেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র বিশ্বকে ইহুদীবাদের পদানত করার জন্য সাপের মত ধূর্ত কৌশল অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে সাপকেই প্রতীক চিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করে।

এ সাপের মস্তক ইহুদীবাদের পরিকল্পনা রচনাকারীদের এবং এর দেহ সমগ্র ইহুদী জন সমষ্টির প্রতীক। ইহুদীবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগঠন কায়েম করা হয় তার সংগঠন ও নেতৃত্ব গোপন রাখা হয়। এমনকি ইহুদী জনসাধারণও এ সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়।"

"হুবহু পরিকল্পনা মাফিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য এ সাপের মাথা জাইওন পাহাড় পর্যন্ত পৌছবে এবং এর আগে সে ইউরোপের চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরে এ মহাদেশটিকে শক্তভাবে ঘেরাও করে ফেলবে এবং এরপর ধীরে ধীরে সারা দুনিয়া তার আবেষ্টনীর আওতায় চলে যাবে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক প্রাধান্য কায়েম করে, এর মাধ্যমেই সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।"

"সাপের মাথাটিকে জাইওন পাহাড়ে ফিরে যেতে হলে ইউরোপের সকল সার্বভৌম শক্তিগুলোকে খর্ব করতে হবে। অর্থনৈতিক দূরাবস্থা সৃষ্টি ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অবনতি ও নৈতিক অধপতন ঘটিয়েই এসব সার্বভৌম রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে হবে। আর নৈতিক অধপতন ঘটানোর জন্য ফরাসী অথবা ইটালীয় জাতীয়তার ছদ্মবেশ ধারণ করে ইহুদী রমণীগণ সহায়তা করবে। জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার সুনিশ্চিত হাতিয়ারই হচ্ছে যুবতী নারীর দল।"

"সাপটি যেসব দেশ অতিক্রম করেছে সেসব দেশের শাসনতন্ত্রের ভিত্তি চূর্ণ করে দিয়েছে। বাহ্য দৃষ্টিতে শক্তিশালী মনে হলেও জার্মান দেশ প্রকৃতপক্ষে শাসনতান্ত্রিক সংকটের সম্মুখীন। জার্মান ও ইংল্যাণ্ডকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও সুযোগ দেয়া হচ্ছে। রাশিয়ায় এ সাপের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এ দু'টি দেশ অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কারণ, সাপের (১৯০৫ সালে) তৎপরতা রাশিয়াতেই কেন্দ্রীভূত। নকসাতে সাপের

পরবর্তী গন্তব্যস্থল চিহ্নিত করা হয়নি। কিন্তু কতকগুলো তীর চিহ্ন থেকে বুঝা যায় যে, সাপটির গতিমুখ মস্কো, কায়েফ ওডেসা এবং আরো দক্ষিণ-পূর্ব (অর্থাৎ মুসলিম দেশগুলোর) দিকে।

নাইলাসের উপরোক্ত উদ্ধৃতির পর প্রটোকলের ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদক নিম্নের অংশটুকু যোগ করেছেন।

"দুর্ধর্ষ ইহুদীদের শক্তি কেন্দ্র কোন্ কোন্ শহরে এবং কোথায় তাদের কি পরিমাণ শক্তি রয়েছে তা এখন আমাদের জানা হয়ে গেছে। ইহুদী সাপের গতিপথ জেরুজালেম পর্যন্ত পৌছার পূর্বে কনষ্টান্টিনোপলকেই সর্বশেষ মনজিল হিসেবে দেখানো হয়েছে। তুর্কীতে ইহুদীদের বিপ্লব ঘটানোর অনেক আগে এ নকসাটি তৈরী করা হয়েছিল।"

ইসরাঈল রাষ্ট্রে স্থাপনের পর কালনাগীনীর গতি থেমে যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ইসরাঈল হচ্ছে অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বকে পদানত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য শক্তিকেন্দ্র। ইহুদীবাদের প্রবর্তকগণ "বৃহত্তর ইসরাঈল" রাষ্ট্রে যেসব এলাকা শামিল করতে চায় ইসরাঈলের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে সেসব দেশ। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সরাসরি হস্তক্ষেপ ও কমুনিষ্টদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ইসরাঈল তার চতুষ্পার্শস্থ মুসলিম এলাকায় মজবুত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার পর মুসলিম জাহানের অবশিষ্ট অংশ খুবই অসহায় শিকার হিসেবে গণ্য হবে। আর মজবুত ইসলামী বুনিয়াদের উপর জন্মগ্রহণ করার দরুন পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের দৃষ্টিতে একটি শক্তিশালী ও উদ্বেগজনক দুশমন। এমতাবস্থায় "ফ্রিম্যাসন" আন্দোলনের ছদ্মবেশে ইহুদীদের নষ্টামীর কেন্দ্রগুলোকে পাকিস্তান থেকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে।

বিশেষ কৈফিয়ত

এবার Protocol of the learned Elders of Zion (বিজ্ঞ ইহুদী মুরুব্বিদের কায়দা-কানুন) পুস্তকখানার বিষয়বস্তু পাঠকদের খেদমতে পেশ করছি।

নানা কারণে শাব্দিক তরজমার পরিবর্তে ভাবান্তর করাই ভাল বিবেচনা করেছি এবং পুনরুক্তিগুলোকে যথাসম্ভব পরিহার করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা নিরর্থক মনে করে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছি। এজন্য পরবর্তী অধ্যায়গুলোকে প্রটোকোল বইয়ের আক্ষরিক তরজমা বলা চলে না। তবে বিষয়বস্তু ঠিক ঠিকভাবেই ভাবান্তর করা হয়েছে।

[এক]

প্রটোকোল ॥ ষড়যন্ত্রের সর্বমুখী জাল

জোর যার মুল্লুক তার। আযাদী একটা খেয়াল মাত্র। উদারতাবাদ, স্বর্ণ, ঈমান, নিজস্ব সরকার। পুঁজির নিরংকুশ ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক দুশমন। উত্তেজিত জনতা। উচ্ছৃংখলতা। রাজনীতি বনাম নৈতিকতা। শক্তিমানের অধিকার। ইহুদী ম্যাসনদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। উদ্দেশ্য ভাল হলে সকল উপায় পন্থাই ভাল। জনতা একটি অন্ধ শক্তি। রাজনীতির ক, খ, গ। সবচেয়ে বেশী সন্তোষজনক শাসনব্যবস্থা হচ্ছে দলাদলি সৃষ্টি। সর্বাত্মক ক্ষমতা। শরাব। শ্রেণী বিদ্বেষ। দুর্নীতি। ইহুদী ম্যাসন। সরকারের নীতি ও নিয়ম-কানুন। ভীতি। 'আযাদী, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।' গোত্রীয় শাসনের মূল নীতি। গয় (অন-ইহুদী) আভিজাত্যের মূলোৎপাটন। নয়া আভিজাত্য বোধ। মনস্তাত্বিক হিসেব-নিকেশ। আযাদী শব্দের অসারতা। জন প্রতিনিধিদের অপসারণের ক্ষমতা।



সুন্দর ও আকর্ষণীয় শব্দজাল পরিত্যাগ করে আমরা প্রতিটি কথার সহজ-সরল ভাবার্থ প্রকাশ করবো। সোজা যোগ বিয়োগ ও তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ তথ্যাবলীর উপরে আমরা আলোকপাত করবো। আমি যা এখানে প্রকাশ করতে চাই তা হচ্ছে দু'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কর্মধারা অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে আর অপরটি হচ্ছে গইমদের (অন-ইহুদী)।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সদগুণাবলী বিশিষ্ট লোকের তুলনায় অসৎ প্রবৃত্তির লোকই সংখ্যায় অনেক বেশী। এ জন্য তাদের শাসন করার উত্তম পথ হচ্ছে জবরদস্তি ও সন্ত্রাসমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা। জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় এদের শাসন করা যায় না। প্রতিটি মানুষই ক্ষমতা ভালবাসে। আর সাধ্য শক্তিতে এঁটে উঠতে পারলে প্রতিটি মানুষই ডিক্টেটর হতে চাইবে। অপর সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে না এমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

মানুষ নামধারী শিকারী পশুদের নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে কিসে ? তাদের এযাবত কোন্ শক্তি পরিচালনা করে আসছে ?

সমাজ গঠনের শুরুতে তারা পাশব ও অন্ধশক্তির তাবেদার ছিল। পরবর্তীকালে তারা আইনের তাবেদার হয়েছে। আর আইন ঐ একই শক্তি; তবে তার স্বরূপ পর্দা ঢাকা।

আমার স্থির বিশ্বাস—"জোর যার মুল্লুক তার" নীতিই হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের স্বাভাবিক নিয়ম।

রাজনৈতিক আযাদী একটা খেয়ালমাত্র—বাস্তব সত্য নয়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে জনগণকে নিজের দলে সামিল করা দরকার আর ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আযাদীর এ কাল্পনিক ছবিটিকে কখন কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নেয়াই হচ্ছে কীর্তিমান ব্যক্তির কৃতিত্ব। এ কাজটা সহজ হয়ে যায় যদি বিরোধী পক্ষও আযাদী এবং তথাকথিত উদারতাবাদের সংক্রামক রোগে রোগাক্রান্ত হয় এবং এসব কাল্পনিক খেয়ালের খাতিরে নিজের ক্ষমতার অংশবিশেষ ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে যায়। এখানেই আমাদের উপস্থাপিত সূত্রের বিজয়। জীবনের বাস্তব নিয়মানুসারে সরকারের শিথিল শাসনক্ষমতা অনতিবিলম্বে নয়া সরকারের হস্তগত হয়। কেননা, জাতির অন্ধ জনশক্তি একদিনও নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ছাড়া চলতে পারে না। এ জন্যই নয়া শাসন কর্তৃপক্ষ পুরাতন শিথিল কর্তৃপক্ষের স্থান সহজে দখল করে নেয়। আমাদের জামানায় উদার-নৈতিক শাসকদের স্থান দখল করে নিয়েছে স্বর্ণ শক্তি। এক সময় ছিল যখন নিছক বিশ্বাসের জোরে শাসন চলতো। আযাদীর ধারণা কখনও বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারে না। কেননা এ ধারণাটিকে কিভাবে সঠিক উপায়ে বাস্তবায়িত করা যায় তা কারো জানা নেই। কিছুদিনের জন্য মানুষকে নিজেদের হাতে সরকার পরিচালনার জন্য ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট। এরূপ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তারা একটা উচ্ছৃংখল জনতায় পরিণত হয়ে যাবে। ঠিক এ সময়ই আমরা তাদের মধ্যে আমাদের নিজস্ব পন্থায় খেলা শুরু করবো যেন অচীরেই তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আর যুদ্ধের দাবানলে তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জাতীয় মর্যাদা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

কোন রাষ্ট্র নিজস্ব অব্যবস্থার দরুন ধ্বংস হোক অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন বহিঃশত্রু পদানত হোক উভয় অবস্থায়ই যে এ রাষ্ট্রের পতন ঘটে এ একটা অনস্বীকার্য সত্য। আর এ উভয় ধরনের পতন ঘটানোর উপায়-পন্থা আমাদেরই আয়ত্বে। পুঁজির সর্বাত্মক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই করায়ত্ব। রাষ্ট্রকে এমন অবস্থায় পৌছানো হবে যে, সে পুঁজির সামান্য একটু খড়-কুটার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে সাহায্যের আশায় হাত বাড়াবে। অন্যথায় ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডুবে যাবে।

যদি কোন উদারচেতা ব্যক্তি আমার এসব উক্তি ও মন্তব্যকে নৈতিকতা বিরোধী বলে আখ্যা দেয় তাহলে আমি তাঁর কাছে নিম্নের প্রশ্নগুলো পেশ

করবো। যদি প্রতিটি রাষ্ট্রেরই দু' ধরনের দুশমন থাকে একটি বাইরের আর অপরটি ভেতরের ; তাহলে বাইরের দুশমনের মুকাবেলায় যুদ্ধ ও সংঘর্ষের যাবতীয় উপায়-পন্থাকেই বৈধ ও নৈতিকতা সম্মত মনে করা হয়। বিরোধী পক্ষের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার সকল পরিকল্পনা গোপন রাখা, রাত্রিতে অতর্কিতে দুশমনের উপর আক্রমণ করা অথবা বিপক্ষীয় সৈন্য বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক সৈন্য নিয়ে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া জনিত উপায়-পন্থা যদি নৈতিকতা বিরোধী বিবেচিত না হয় তাহলে যে জঘন্যতর দুশমন সমাজের কাঠামো ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট তার বিরুদ্ধে ঐ একই ধরনের উপায়-পন্থা অবলম্বন করাকে অসংগত ও নৈতিকতা বিরোধী কেন মনে করা হবে।

সাধারণ জনসমষ্টিকে যুক্তিসংগত উপদেশ ও ভাল কথায় সাফল্যজনকভাবে শাসন করা যাবে বলে আশা করা কি সুস্থ মস্তিষ্ক ও যুক্তিবাদী লোকের পক্ষে সম্ভব ? বিপরীত কোন যুক্তি ও উপদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা যুক্তি খুঁজে বের করা কঠিন নয়। এসব যুক্তি যতই ভিত্তিহীন হোক না কেন তা জনসমষ্টিকে আকৃষ্ট করতে পারে, কেননা তাদের বিচার-বুদ্ধি খুবই অগভীর। সাধারণ জনসমষ্টির ভেতর ও বাইরের সকল লোকই সামান্যতম উত্তেজনা, মূল্যহীন আকীদা-বিশ্বাস, পূর্ব প্রচলিত রীতিনীতি এবং ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে সহজেই দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয় এবং এর ফলে কোন বিষয়েই তারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এমনকি একটি পরিপূর্ণ যুক্তিসংগত বিষয়েও তারা মতৈক্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়। জনসভাগুলোতে গৃহীত প্রতিটি প্রস্তাব, ঘটনাচক্র অথবা সাজানো সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভরশীল। আর জনগণের এ সংখ্যাধিক্য রাজনৈতিক গুপ্ত তথ্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা এমন সব হাস্যাস্পদ প্রস্তাব গ্রহণ করে যা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের বীজ বপন করে দেয়।

রাজনীতি ও নৈতিকতার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। নৈতিকতা পরিচালিত শাসক দক্ষ রাজনীতিবিদ নয়। তাই তার ক্ষমতার আসন সর্বদা টলটলায়মান। যে ব্যক্তি শাসন করতে চায় তাকে ধূর্ততা ও অন্যকে বিশ্বাস করানোর চাতুর্য আয়ত্ব করতে হবে। সরলতা ও সাধুতার মত মহান গুণাবলী রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা মহাপাপ ; কেননা, এ গুণাবলী শক্তিশালী দুশমনের চেয়েও অধিকতর সক্রিয় ও সুনিশ্চিত পন্থায় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিকে তার আসন থেকে নামিয়ে দেয়। গইমদের (অন-ইহুদী) পরিচালিত রাষ্ট্রে এসব বিষয় সদগুণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে কখনও এসব বিষয় গ্রহণ করা বিজ্ঞের কাজ বিবেচিত হবে না।

আমাদের দৃষ্টিতে শক্তিই ন্যায়। "ন্যায়নীতি" একটি গুণবাচক শব্দমাত্র। বাস্তবে এর কোন অস্তিত্ব নেই। ন্যায়নীতির সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা হচ্ছে, "আমি

যা চাই, তা আমাকে দাও যেন আমি প্রমাণ করতে পারি যে, আমি তোমার তুলনায় বেশী শক্তিশালী।"

ন্যায়নীতির শুরু এবং শেষ কোথায়? যদি কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হয় কিংবা শাসকবর্গ যদি ন্যায়নীতি ও উদারতার ক্রমবর্ধমান দাবীর বন্যায় নিজেদের ভাসিয়ে দেয় তাহলে সেখানে আমি অপর একটি ন্যায়নীতির সন্ধান পাই। সেটি হচ্ছে, প্রবলের ন্যায়নীতি অনুসারে এ দুর্বল শাসকদের আক্রমণ করা, এর সমস্ত কর্তৃত্ব হাওয়ায় মিশিয়ে দেয়া এবং এমন একটি সংস্থা গড়ে তোলা যেন তা ন্যায়নীতির পূজারীদের সার্বভৌম মনিব বনে যায়। কেননা, উদারতা ও ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করে তারা নিজেরাই আমাদের প্রভুত্ব ও তাদের দাসত্বের পথ খোলাসা করে দিয়েছে।

বর্তমান জরাজীর্ণ কর্তৃত্বের মুকাবিলায় আমাদের কর্তৃত্ব হবে অত্যন্ত পরাক্রান্ত। যে পর্যন্ত আমরা এতটা শক্তি সঞ্চয় করতে না পারি যেন কোন ধূর্ততম ব্যক্তির পক্ষেও আমাদের ক্ষমতাকে হেয়প্রতিপন্ন করা সম্ভব না হয়; সে পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অদৃশ্য থাকবে।

সাময়িকভাবে এখন আমরা যে অশুভ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি তা থেকে পরিণামে একটি স্থিতিশীল শাসনব্যবস্থার কল্যাণকর ব্যবস্থা জন্মগ্রহণ করবে। আর উদার নীতি গ্রহণের ফলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল তা আমাদের স্থিতিশীল শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পুন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং স্বাভাবিক গতিতে যাত্রা শুরু করবে। যদি আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলাফল ভাল হয়, তাহলে যে উপায়-পন্থাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তা ভালই বলতে হবে। কাজেই আমাদের পরিকল্পনা রচনার সময় কোন্ পন্থা ভাল কোন্ পন্থা নৈতিক নিয়ম-কানুন সিদ্ধ, এসব বিষয় বিচার-বিবেচনা করার চেয়ে কোন্ বিষয়টি জরুরী ও আমাদের জন্য উপকারী তাই লক্ষ্য করা উচিত।

আমাদের কাছে এমন একটি সুপরিকল্পিত কার্যসূচী রয়েছে যার এক চুল পরিমাণ অংশও বাতিল করলে আমাদের শত শত বছরের শ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সন্তোষজনক কার্যক্রম গ্রহণের বিস্তারিত উপায়-পন্থা উপলব্ধি করার জন্য জনসাধারণের নৃশংতা, শৈথিল্য এবং অস্থিরচিত্তের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া দরকার। এরা নিজেদের জীবনের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে কি পরিমাণ অযোগ্য তাও উপলব্ধি করা অত্যন্ত জরুরী। এটাও মনে রাখতে হবে যে, জনসমষ্টির শক্তি একটা বোধশক্তিহীন, যুক্তিবিবর্জিত ও অন্ধ

শক্তি। এ শক্তি সর্বদাই কোন চতুর মহলের অনুগ্রহ ও পরামর্শের মুখাপেক্ষী। অন্ধ অপর অন্ধকে গভীর খাদে নিক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোন পথ দেখাতে পারে না। অনুরূপভাবেই জনসাধারণ কতকগুলো মস্তিষ্কবিহীন লোকের সমষ্টি। যদিও তাদের মধ্যে প্রতিভাশীল লোকের অভাব নেই তথাপি রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধির অভাবের দরুন তারা সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া ছাড়া কোন কল্যাণকর নেতৃত্ব দিতে পারে না।

যে ব্যক্তি শৈশব থেকেই স্বাধীনভাবে শাসন করার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা পেয়েছে একমাত্র সেই রাজনৈতিক বর্ণমালা দ্বারা কখন, কোন্ শব্দ, কিভাবে গঠন করা যায় তা বুঝতে পারে। একটি জনসমষ্টিকে তাদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিলে তাদেরই মধ্য থেকে উচ্ছৃংখল মহলটি অগ্রসর হয়ে পারস্পরিক ক্ষমতা ও মান-ইজ্জতের দ্বন্দ্ব শুরু করে শীঘ্রই সমাজে বহু দল ও উপদল সৃষ্টি করবে এবং সর্বত্র চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি করে সমাজকে ধ্বংস করে দেবে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে কি শান্তভাবে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিষয়ে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে দেশ পরিচালনার ব্যাপারে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে উঠে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব ? তারা কি বাইরের দুশমনের আক্রমণের মুখে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ ? এটা অচিন্তনীয়। এরূপ চেষ্টা করলে জনতার মধ্যে যতগুলো মস্তিষ্ক রয়েছে ঠিক তত অংশেই তাদের পরিকল্পনা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং বিভিন্ন অংশ পারস্পরিক সাদৃশ্য হারিয়ে এমন একটি অবোধগম্য নকসা পেশ করবে যা কার্যকরী করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

একমাত্র নিরংকুশ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসকের পক্ষেই সুষ্ঠু ও বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রাষ্ট্র যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের উপর সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন্টন সম্ভব। আমরা তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সকল দেশের জন্যই উত্তম শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে একজন মাত্র দায়িত্বশীল লোকের হাতে সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করণ। সর্বাত্মক শাসন ক্ষমতা ছাড়া কোন সভ্যতাই টিকতে পারে না। কেননা, জনসাধারণ সভ্যতার ধারক-বাহক নয় বরং তাদের পরিচালকগণই সভ্যতার প্রকৃত সংরক্ষক।

জনসাধারণ বর্বর—সুযোগ পেলেই সে বর্বরতা প্রকাশ করে, তাই সাধারণ মানুষ আযাদী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত গতিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে—আর নৈরাজ্য হচ্ছে চরম পর্যায়ের বর্বরতা। নেশাগ্রস্ত জানোয়ারের দিকে তাকাও —শরাব পানের ফলে তার মাতাল অবস্থা লক্ষ্য কর। এটাই হচ্ছে তাকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করার উপযুক্ত সময়। এভাবে গইমদের মাতাল করে কাজ উদ্ধার

করার পথ একমাত্র আমাদেরই জ্ঞাত। এরা তরল পানীয়ের নেশায় বিভোর। এদের যুবসমাজ নৈতিক অধপতন ও শ্রেণী বিদ্বেষে বোধশক্তিহীন হয়ে গেছে। এদের এ অবস্থায় ঠেলে দেয়ার জন্য আমাদের এজেন্টগণ ধনীদের গৃহ শিক্ষক, উর্দী পরিহিত (বা বিশেষ পোশাকে সজ্জিত) ভৃত্য ও ধাত্রী (Governess) রূপে কেরানী ও অপরাপর শ্রেণীর কর্মচারীর বেশে কাজ করছে। জনসমাগম স্থলে আমাদের বিশেষ নারী এজেন্টগণও গইমদের নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটানোর কাজে লিপ্ত রয়েছে আর নারী এজেন্টদের সাথে গইম সমাজের ঐসব "সোসাইটি গার্ল"ও (Society Girl) রয়েছে যারা, স্বেচ্ছায় দুর্নীতি ও বিলাসিতার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করে চলে।

আমাদের গুপ্ত সংকেত হচ্ছে শক্তি ও বিশ্বাস করানো, শক্তিই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়।

আর এটা গোপন রাখা নেতার অপরিহার্য গুণাবলীর অন্যতম। বলপ্রয়োগই হবে একমাত্র অপরিহার্য নীতি এবং যে শাসক তার শাসনদণ্ড নূতন শক্তির নিকট হস্তান্তর করতে প্রস্তুত নয়, ধূর্ততা এবং অপরের আস্থা অর্জনই হবে তার শাসন নীতি। এটাই কল্যাণের একমাত্র পথ। সুতরাং ঘুষ, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আমরা বিন্দুমাত্র পশ্চাদপদ হবো না যদি তা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে অপরের সম্পত্তি কি উপায়ে বিনা দ্বিধায় জবর দখল করা যায় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে— যদি এ জবর দখলের দ্বারা অপরের বশ্যতা ও আমাদের কর্তৃত্বের পথ খোলাসা হয়।

আমাদের রাষ্ট্র যখন শান্তিপূর্ণ বিজয় অভিযানে অগ্রসর হবে তখন যুদ্ধের ভয়াবহতা পরিহার করার জন্য প্রয়োজন বোধে কিছু সংখ্যক লোককে অতি সংগতভাবেই মৃত্যুদণ্ড দান করবে যেন এভাবে ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে জনসাধারণকে অন্ধভাবে সরকারের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা যায়। যথোপযুক্ত অথচ নির্মম কঠোরতাই হচ্ছে রাষ্ট্র শক্তির প্রধান উপাদান। শুধু লাভের জন্যই নয় বরং কর্তব্য সম্পাদন এবং বিজয়ের জন্যও আমাদের বলপ্রয়োগ এবং অপরকে বিশ্বাস করানোর নীতি অবলম্বন করতে হবে। কঠোরতার মাধ্যমেই আমরা এমনভাবে বিজয়ী হতে পারব যে, সকল গভর্নমেন্টকেই আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের (Super Goverment) নিকট নতি স্বীকার করতে হবে। এতটুকু জেনে নেয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে যে, আমরা অবাধ্যাচরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চরম নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করতে প্রস্তুত।

অতি প্রাচীনকালে আমরাই সর্বপ্রথম জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে "উদার নীতি" "সমানাধিকার" ও "ভ্রাতৃত্বের" ধুয়া তুলেছি। বোকা তোতা পাখীর দল

এরপর থেকে এ শব্দগুলোকে অসংখ্যবার উচ্চারণ করছে এবং চারদিক থেকে ছুটে এসে আমাদের এ ফাঁদে ধরা দিয়ে পৃথিবীর সত্যিকার কল্যাণ ও জনগণের প্রকৃত আযাদী হরণ করায় সহায়তা করেছে। এর আগে জনগণের চাপ থেকে আযাদী ও কল্যাণকে বহু যত্নে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। গইম সমাজের ভাবী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এসব গুণকে উচ্চারণ করেছে কিন্তু এর অন্তর্নিহীত অর্থ বুঝতেই পারেনি। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শব্দগুলোর মধ্যে যে গরমিল রয়েছে তাও তারা লক্ষ্য করেনি। তারা দেখতে পায়নি যে, প্রাকৃতিক জগতেই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত নয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই আযাদী বলতে কোন কিছু নেই। তারা দেখতে পায়নি যে, প্রকৃতিই মন, চরিত্র ও কর্মক্ষমতার তারতম্য সৃষ্টি করেছে এবং যেভাবে সে সকলকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে নিতে বাধ্য করেছে ঠিক সেভাবেই সামাজিক তারতম্যও মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। এ বুদ্ধিমানের দল মুহূর্তের জন্যও এক জায়গায় থেমে চিন্তা করে দেখেনি যে, জনসমষ্টি একটা অন্ধশক্তি এবং যেসব ভূঁইফোড় ব্যক্তি এ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে তারাও ঐ ভোটদাতা জনগণের মতই অন্ধ। তারা এটাও ভেবে দেখেনি যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্বোধ হলেও শাসনকার্য চালাতে পারে ; পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রতিভাশীল হলেও রাজনীতি ক্ষেত্রে কিছুই বুঝতে পারে না।

গইম সমাজ এসব বিষয়ের প্রতি কোনই গুরুত্ব আরোপ করেনি। শাসন ক্ষমতা গোত্রীয় ব্যবস্থায় সংরক্ষিত ছিল। পিতা তার সন্তানকে রাজনৈতিক ব্যাপারে এমন সব জ্ঞানগর্ভ বিষয় শিক্ষা দিতেন যা ঐ গোত্রের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো এবং এ গোত্রের কোন সদস্যই শাসিতদের কাছে তা প্রকাশ করতে রাজী হতো না। কালে গোত্রীয় ব্যবস্থাধীন পিতার রাজনৈতিক জ্ঞান পুত্রের উত্তরাধিকারে আসার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল এবং এরই ফলে আমাদের বিজয় সহজতর হলো।

পৃথিবীর কোণায় কোণায় "উদার নীতি" "সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্বের" বুলি বিপুল জনসমষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে এবং এক বিরাট বাহিনী সোৎসাহে আমাদের ঝাণ্ডা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এ সাফল্যের জন্য এজেন্টগণ সত্যই ধন্যবাদার্হ।

আমাদের প্রবর্তিত এ শ্লোগানগুলো গইম সমাজের সুখ-সমৃদ্ধিকে উই পোকার মত খেয়ে যাচ্ছে, সর্বত্র শান্তি, সুখ, সংহতি ও গয় রাষ্ট্রের যাবতীয় সংস্থা ধ্বংস করে চলেছে।

এ ধ্বংসলীলা আমাদের বিজয়ে সহায়ক হয়েছে। আমাদের হাতে কর্তৃত্বের রশি এসেছে। এ রশি টেনে টেনে আমরা তাদের অধিকার হরণ করেছি এবং

গইম সমাজে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নামক যে মহলটি—আমাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষার কাজ করতে সমর্থ ছিল সে শ্রেণীর অস্তিত্বই মিটিয়ে দিয়েছি। গইম সমাজের স্বাভাবিক এ বংশানুক্রমিক সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ধ্বংস্তুপের উপর আমরা আমাদের শিক্ষিত ও অর্থশালী লোকদের দ্বারা অপর একটি নয়া সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী স্থাপন করেছি। এ নয়া সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীতে শুধু অর্থশালী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণই শামিল হতে পারে। আর অর্থের জন্য তাদের সর্বদাই আমাদের মুখাপেক্ষী হতে হয়। আর শিক্ষা ? শিক্ষার মূল ভাবধারাটিও আমাদেরই বিজ্ঞ মুরুব্বি শ্রেণীর লোকেরাই নিয়ন্ত্রণ করছে।

আমাদের বিজয় আরও সহজ করার জন্য আমরা যে সমস্ত মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়েছি—সর্বদাই তাদের অন্তরের দুর্বলতম স্থানগুলোতে হস্ত সঞ্চালন করেছি। নগদ লেন-দেন, সম্পদের লোভ, বস্তুতান্ত্রিক প্রয়োজন পূরণের জন্য মানসিক চাঞ্চল্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় মানুষের স্বতস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতে পারে। কেননা এসব দুর্বলতার দরুন মানুষ তার নিজের ইচ্ছাশক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেয়—যারা কর্মপ্রেরণার মূল্য দিয়ে তাদের স্বত্বাকেই খরিদ করে নেয়।

আযাদী শব্দটির অর্থগত অস্পষ্টতার দরুন আমরা সকল দেশের জনতাকে একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ, আর সরকার তাদের প্রতিনিধি মাত্র। আর পুরাতন ছিন্ন দস্তানার মতই প্রতিনিধিকে যে কোন সময় বদলানো যেতে পারে। জনসাধারণের প্রতিনিধিকে পরিবর্তনের এ সম্ভাবনাটিই তাদের নেতাগণকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং এ ক্ষমতাবলে আমরা তাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার গুপ্ত অধিকার লাভ করেছি।

[দুই]

ইহুদী প্রাধান্যের গোড়ার কথা

ইহুদী প্রাধান্যের বুনিয়াদ অর্থনৈতিক সংগ্রাম। কাগজী সরকার ও গুপ্ত পরামর্শদাতাগণ ধ্বংসাত্মক নীতির সাফল্য। কার্যসূচীকে খাপ খাইয়ে নেয়ার যোগ্যতা। প্রেসের ভূমিকা। সোনার মূল্য ও ইহুদীদের কুরবানীর গুরুত্ব।



যথাসম্ভব আমাদের এ বিষয় লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী যেন যুদ্ধের ফলে অঞ্চল বিশেষের কোনই ফায়দা হতে না পারে। যুদ্ধকে অর্থনৈতিক দিক থেকে এমন পর্যায়ে পৌছিয়ে দিতে হবে যেন যুদ্ধরত জাতিসমূহ আমাদের অর্থনৈতিক সাহায্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়। অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌছে যাবে তখন উভয় পক্ষই আমাদের আন্তর্জাতিক এজেন্টদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আর আমাদের এজেন্টগণ লক্ষ লক্ষ চোখের দ্বারা অবিরাম দুনিয়ার ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে চলছে। কোন বাধা-বিপত্তিই তাদের সদাসচেতন চোখগুলোর দৃষ্টিশক্তিকে কোথাও সীমিত করতে পারে না। আমাদের আন্তর্জাতিক শক্তি তখন যুদ্ধক্লান্ত জাতিগুলোর নিজস্ব শক্তি হরণ করবে এবং জাতিগুলোকে ঠিক সেভাবেই শাসন করবে যেভাবে রাষ্ট্রের বেসামরিক আইন দেশবাসীদের শাসন করে এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে।

জনগণের মধ্য থেকে আমাদের একান্ত অনুগত যেসব লোকদের আমরা শাসন পরিচালনার জন্য বাছাই করবো তারা শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের প্রতিভাশীল বিশেষজ্ঞদের হাতের পুতুল হয়ে যাবে। এসব বিশেষজ্ঞদের শৈশব থেকেই এ ধরনের অবস্থায় শাসন পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করা হয়েছে যেন তারা এসব পুতুলদের ঠিকভাবে নাচাতে পারে। আমাদের এসব বিশেষজ্ঞগণকে শাসন ক্ষমতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এজন্য তারা আমাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে —ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে দেশে যা যা ঘটছে সেগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ভবিষ্যতের কার্যসূচী স্থির করবে। গইম সমাজ ইতিহাসের সঠিক পর্যবেক্ষণকে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত নয় বরং তারা বাঁধাধরা নীতি নিয়ম মেনে চলতে অভ্যস্ত। ঘটনাবলীকে সমালোচনার দৃষ্টিতে যাচাই এ কার্যকরণের ফলাফল বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে তারা অভ্যস্ত নয়। আমাদের তাই তাদের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়।

সময় না আসা পর্যন্ত তাদের আমোদ স্ফূর্তিতে দিন কাটাতে দাও অথবা ভবিষ্যতে নূতন ধরনের সুখ-ভোগের সম্ভাবনাময় আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে দাও ; অথবা অতীতে যেসব সুখ-সুবিধা ভোগ করেছে তার সুখ স্মৃতিতে ভুলিয়ে রাখ। আমাদের কার্যক্রমের চাহিদা পূরণ করার জন্য আমরা তাদের যে কাজে ব্যবহার করতে চাই সে কাজ সম্পাদনে যেন তারা প্রধান ভূমিকায় নেমে আসে ; তার ব্যবস্থা কর। এ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের প্রেস মারফত অবিরাম প্রচার চালিয়ে আমাদের নীতিগুলোর প্রতি জনগণের অন্ধ আস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করে চলছি।

গইম সমাজের বুদ্ধিজীবী মহলের মন-মগজকে আমাদের মতলব মত গড়ে তোলা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে তাদের ব্যবহার করার জন্য আমাদের দালাল গোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ মহল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। আর ঐসব বুদ্ধিমানেরা বিচার-বিশ্লেষণ না করেই আমাদের পরিবেশিত তথ্যগুলোকে কার্যকরী করতে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের এসব উক্তিকে এক মুহূর্তের জন্যও ফাঁকা বিবেচনা করো না। ডারউইনী মতবাদ (Theory of Evolution), মার্ক্সীয় মতবাদ (Marxism) এবং নাজী মতবাদের (Nazism) সাফল্যের জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছিলাম তা খুব সাবধানে স্মরণ করে দেখ। আমাদের ইহুদী সমাজের প্রতিটি লোকের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসব মতবাদের মধ্যে লুক্কায়িত সংহতি বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী দেখা উচিত।

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের জন্য বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা নৈতিক মান ও মনোভাব পর্যবেক্ষণ করা অপরিহার্য।

আমাদের বিজয়ের জন্য যে নিয়ম-পদ্ধতি করা হয়েছে তার যান্ত্রিক অংগগুলোকে যদি বিভিন্ন ধরনের স্বভাব ও চরিত্রের লোকদের উপযোগী করে পেশ করতে ব্যর্থ হই এবং অতীতের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে বর্তমানে এসব নীতির বাস্তবায়নের সঠিক পন্থা নিরূপণ করতে না পারি তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রগুলোর হাতে জনগণের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টিকারী একটি বিরাট শক্তি রয়েছে—আর সে শক্তিটি হচ্ছে প্রেস। কোন্ কোন্ কাজ করা অত্যন্ত জরুরী প্রেস তার ফিরিস্তি পেশ করেন ; জনগণের অভাব অভিযোগ ও অসন্তুষ্টির কারণগুলো প্রকাশ করে আর অসন্তুষ্টির সৃষ্টিও করে। বাক স্বাধীনতার বিজয় প্রেসের মাধ্যমেই স্বীকৃতির রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু গইম